মোহর

প্রফুল্ল রায়

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ : শ্রীসুকান্ত রায়

প্রকাশক :
পূর্ণেন্দু বসু
আনন্দ নিকেতন, নববারাকপুর
২০২/২, রামকৃষ্ণ সরণী (অধুনা বিধানচন্দ্র রায় সরণী)
উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ৭০০ ১৩৯

রীনা ঘোষ
সঞ্জিত ঘোষ
স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

সম্পর্ক
দুই দিগন্ত
উত্তরার উপাখ্যান
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
বিন্দুমাত্র
আলোয় ফেরা
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
চতুর্দিক
আমাকে দেখুন
(১ম ২য় ৩য় ৪র্থ পর্ব)
আমাকে দেখুন (অখণ্ড সংস্করণ)
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
মানুষের মহিমা
অদিতির উপাখ্যান
অতল জলের দিকে
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
জন্মভূমি
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
আক্রমণ
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের-সঙ্গে দেখা
এক নায়িকার উপাখ্যান
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
(১ম ও ২য় পর্ব)
একাকী অরণ্যে
সিন্ধুপারের পাখি
যুদ্ধযাত্রা
স্বনির্বাচিত গল্প
শান্তিপর্ব
সাধ আহ্লাদ
হীরের টুকরো
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
রাবণবধ পালা
ক্রান্তিকাল

মোহর

ছুটির দিনের এই দুপুরবেলায় রাস্তায় লোকজন খুব কম। গাড়ি টাড়িও বিশেষ চোখে পড়ে না। যা দু-একটা দেখা যাচ্ছে সেগুলোর সারা গায়ে আলস্য মাখানো। যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই তাদের ; গড়িমসি করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

নভেম্বর মাস শেষ হয়ে এল। কলকাতা মেট্রোপলিসের ওপর দিয়ে কনকনে উত্তুরে হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার ; কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। সূর্য সরাসরি মাথার ওপরে উঠে এসেছে। শীতের ঠাণ্ডা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক।

এই সময় মধ্য কলকাতায় 'শান্তি ভবন' নামে বিশাল বাড়িটার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মোহর—মোহর দাশগুপ্ত। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। রং খুব ফর্সা না হলেও দারুণ ঝকঝকে চেহারা। ভাল হাইট, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা ফাঁপানো চুল, লম্বাটে মুখ, দৃঢ় চিবুক। চমৎকার স্বাস্থ্য মোহরের। তবে সবচেয়ে বেশি করে যা চোখে পড়ে সেটা হল তার ব্যক্তিত্ব। পরনে জিনস আর ঢোলা ফুল শার্ট যার হাতা দুটো সামান্য গোটানো। শার্টের ওপর বাঁ হাতের কবজিতে স্টিলের চওড়া ব্যাণ্ডে দামী ইলেকট্রনিক ঘড়ি। ডান হাতে পেতলের নকশা-করা ভারী ব্রেসলেট ; আদিবাসী মেয়েরা যেমনটা পরে থাকে। গলায় নৌকো শেপের লকেটওলা সরু সোনার চেন। কাঁধ থেকে একটা ঢাউস চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাথে উঠে 'শান্তি ভবন'-এর প্রকাণ্ড গেটের কাছে চলে আসে মোহর। গেটটা এক ইঞ্চি পুরু লোহার পাত দিয়ে তৈরি। প্রায় সাত ফুট উঁচু। আজ নিয়ে চার বার সে এখানে এল। কিন্তু কোনও বারই গেটটা খোলা দেখেনি ; খুব সম্ভব সর্বক্ষণ ওটা বন্ধ থাকে।

গেটের পাশেই অবশ্য একটা ছোট দরজা চোখে পড়ে। ওখান দিয়েই ভেতরে যাতায়াতের পথ। দরজাটার ওধারে একজন মধ্যবয়সী আবাঙালি দারোয়ান টুলের ওপর বসে আছে। যে ক'দিন মোহর এখানে এল, তাকে ওভাবে ঠিক একই জায়গায় বসে থাকতে দেখছে। সে এগিয়ে কাছে যেতেই দারোয়ানের কপাল সামান্য কুঁচকে গেল। সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ করতে করতে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলে, 'মা'জি, আপনাকে তো আগেই বলে দিয়েছি, অন্দর যানা মানা হ্যায়। আগরওয়াল সাহেবের হুকুম নেই।' চারদিন এখানে আসার কারণে মোহরের মুখটা তার চেনা হয়ে গেছে।

মোহর বলল, 'আমার সব মনে আছে। আমি আগরওয়াল সাহেবের সঙ্গে

আজ দেখা করতে চাই। উনি বাড়িতে আছেন?'

দারোয়ান খুব অবাক হল। অন্য দিন মোহর হেমনলিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছে। আজই প্রথম আগরওয়াল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আছেন। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

'দেখা তো হবে না মা'জি।'

'কেন?'

'সাহেব বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

'আপনি আমাকে আগেও কথাটা জানিয়েছেন। ওঁকে গিয়ে বলুন আমি একটা খুব জরুরি চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'চিটি্ঠি? ঠিক হ্যায়, আমাকে দিন। আমি সাহেবকে দিয়ে দেবো।' দারোয়ান হাত বাড়িয়ে দেয়।

মোহর বলে, 'আপনাকে দিলে হবে না। চিঠি পড়ার পর ওঁর জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে চাই।'

কী ভেবে দারোয়ান বলল, 'আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি সাহেবকে গিয়ে আপনার কথা বলি।'

'আচ্ছা—'

দারোয়ান চলে গেল।

মোহরের 'শান্তি ভবন'-এ বার বার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা করা। কলকাতার প্রাচীন বনেদি বাড়িগুলো নিয়ে তার বন্ধু সুদীপ্ত দিল্লির মান্ডি হাউসের জন্য ছাব্বিশ পর্বের একটা বিশাল ডকুমেন্টারি তৈরির অফার পেয়েছে। ঠিক ডকুমেন্টারি নয়, ডকু-ফিচার বলাই উচিত। এই বাড়িগুলোর ইতিহাসের সঙ্গে যে বংশধরেরা এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণও এতে থাকবে। চোখ-ধাঁধানো, গৌরবময় অতীতের সঙ্গে এখনকার তফাতটা কোথায় এবং কেন, তার চিত্রও এই সব ডকু-ফিচারে দেখা যাবে। সেই সময়ের পটভূমিতে এই সময়কে তুলে ধরাই এগুলোর লক্ষ্য।

মোহর বছর দুই আগে ইংরেজিতে এম.এ করে একটা বড় অ্যাড এজেন্সিতে-পার্ট টাইম কপি রাইটারের কাজ করে। তা ছাড়া ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে কিছু ফ্রিল্যান্স লেখালেখিও। তিন চারটে কলেজে লেকচারশিপের জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে রেখেছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব

তাড়াতাড়িই কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সুদীপ্ত আর সে একই নাম করা কো-এড কলেজে পড়ত। সুদীপ্ত অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্র। ফিজিকসে তার অনার্স ছিল। বি. এস সি'র পর সে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ডাইরেকশনে দু বছরের একটা কোর্স করে এসেছে। দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিল সুদীপ্ত। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ফিল্ম মেকিংটাকেই সে কেরিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। এরই মধ্যে অনেকগুলো ডকুমেন্টারি আর টিভি সিরিয়াল করে ফেলেছে। কাগজে তার ডকুমেন্টারিগুলোর প্রচুর প্রশংসা বেরিয়েছে। কয়েকটা জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। ওর দুটো সিরিয়াল ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। দুটোতেই জোরাল সামাজিক বক্তব্য ছিল যা দর্শকদের নাড়া দিয়েছে। সে যে অন্য ধরনের ছবি করিয়ে সেটা দর্শক, সমালোচকরা তো বটেই, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছে।

কলেজে পড়ার সময় সুদীপ্তর সঙ্গে মোহরের আলাপ এবং বন্ধুত্ব। ক্রমে সম্পর্কটা অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। দু'জনের বাড়ির সকলেই জানে মোহর লেকচারশিপ পেয়ে গেলেই ওদের বিয়েটা হয়ে যাবে।

ফিল্মের ব্যাপারে মোহরের প্রচণ্ড আগ্রহ। সেটা সঙ্গগুণে। সুদীপ্তই এই আগ্রহটা তার মধ্যে তীব্রভাবে জাগিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ফিল্মের মতো পাওয়ারফুল মিডিয়াম অর্থাৎ শক্তিশালী মাধ্যম এখন পর্যন্ত আর দ্বিতীয়টি নেই। মোহর তা মেনেও নিয়েছে। সুদীপ্তর বহু কাজেই সে সাহায্য করে থাকে। বিশেষ করে তাকে ছাড়া চিত্রনাট্য লেখার কথা ভাবতেই পারে না সুদীপ্ত।

এই যে দিল্লি থেকে ডকু-ফিচারের অফার পাওয়া গেছে তার বিশাল একটা দিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহরকে। এর জন্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং রিসার্চের কাজটা তাকে করতে হবে। তিন মাস ধরে কলকাতার কুড়িটা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ডকু-ফিচারের জন্য প্রচুর উপকরণ জোগাড় করেছে সে। যেখানেই গেছে, এই প্রজন্মের বংশধরদের অকুণ্ঠ এবং আন্তরিক সহায়তা পাওয়া গেছে। অনেক সময় অযাচিতভাবে এমন সব তথ্য এবং পারিবারিক অ্যালবাম থেকে ওঁরা এত দুর্লভ ফটো দিয়েছেন যেগুলো ডকু-ফিচারে অন্য একটা মাত্রা এনে দেবে।

আগের সবগুলো বাড়িতেই আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছে মোহর কিন্তু 'শান্তি ভবন'-এ চারদিন হানা দিয়েও ভেতরে ঢুকতে পারল না। অথচ এই বাড়িটাকে বাদ দিয়ে পুরনো, অভিজাত কলকাতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই শতকের গোড়ার দিকের পঁচিশ

তিরিশটা বছর বাঙালির জীবনে মল্লিকদের বিপুল প্রভাব। রাজনীতি, চারুকলা, নাট্যচর্চা, সমাজ সংস্কার, নারীশিক্ষা বা ব্যবসা বাণিজ্যে এই বংশের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। 'শান্তি ভবন'-এ আসেন নি কে? রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, তিলক থেকে শুরু করে স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্রের মতো দেশনায়কেরা কেউ এখানে না এসে পারেননি। সারা ভারতবর্ষ একসময় সসম্ভ্রমে এ বাড়ির নাম উচ্চারণ করত।

উনিশ'শ তিরিশের পর থেকে মল্লিকরা নানা কারণে ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকেন। এক সময় এই বংশ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যায়। যে দু-চারজন পুরনো কলকাতা নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা ছাড়া 'শান্তি ভবন' -এর নাম একালের বাঙালিরা জানে না। ইতিহাস ঘেঁটে নিজেদের অতীত মহিমাকে বার করার মতো সময় বা ধৈর্য তাদের নেই।

সুদীপ্ত কীভাবে যেন জানতে পেরেছিল একমাত্র হেমনলিনী ছাড়া মল্লিক বংশের আর কেউ বেঁচে নেই। সে মোহরকে তাঁর সঙ্গে দেখা করে মল্লিকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করতে বলে। কিন্তু আগরওয়াল নামে লোকটা কিছুতেই 'শান্তি ভবন'-এ ঢুকতে দিচ্ছে না। আগরওয়াল কে, হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে তার এত আপত্তি কেন, কিছুই বুঝতে পারে নি মোহর। সবটাই তার কাছে রহস্যময় এবং খানিকটা সন্দেহজনকও।

মোহরের মাথায় কেমন একটা জেদ যেন চেপে গিয়েছিল। যেমন করে হোক, হেমনলিনীর সঙ্গে সে দেখা করবেই। কিন্তু কী উপায়ে? এ নিয়ে সুদীপ্তর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করার পর দু'জনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে পুলিশ কমিশনারের কাছে চলে যায়।

বেশ কিছুদিন আগে কলকাতার ট্রাফিক পুলিশ নিয়ে একটা চমৎকার ডকুমেন্টারি করেছিল সুদীপ্ত। সেটার দারুণ সুনাম হয়। সে বছরের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল সে। ডকুমেন্টারিটা করার সময় বেশ কয়েক বার ট্রাফিকের ডেপুটি কমিশনার পরমেশ বসুর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। বয়সের অনেকটা তফাত হলেও তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে যায় ওদের। পরমেশ পুলিশের মতো একটা কাঠখোট্টা ডিপার্টমেন্টে পড়ে থাকলেও সিনেমা এবং সাহিত্যের বিস্তর খবর রাখেন। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কিছু লেখালিখিও করতেন। লেখার হাত ছিল বেশ পাকা। লিটল ম্যাগাজিনে তো বটেই, নাম-করা সাপ্তাহিক এবং মাসিকে তাঁর অনেকগুলো কবিতা আর ছোট গল্প বেরিয়েছে। পুলিশে জয়েন করার পর প্রচণ্ড কাজের চাপে

লেখার সময় করে উঠতে পারেন না। না লিখলেও প্রচুর পড়েন। বিখ্যাত একটা ফিল্ম ক্লাবের তিনি মেম্বার। একটু ফাঁক পেলেই ছবি বা নাটক দেখতে ছোটেন। তরুণ কবি, গল্প লেখক, নাট্যকার বা ফিল্মমেকারদের কোনও লেখা কিংবা ছবি ভাল লাগলে তাদের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লেখেন। সুদীপ্তর তিনি একজন ফ্যান।

পরমেশ চার বছর আগে ট্রাফিক পুলিশের ডিসি ছিলেন ; এখন হয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তাঁকে হেমনলিনীর ব্যাপারটা জানাতে বলেছিলেন, 'নো প্রবলেম। তোমাদের ডকু-ফিচারে নিশ্চয়ই মল্লিক বাড়ি থাকবে। আগরওয়ালের পুরো নামটা বল। আমি তাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আশা করি ওটা পড়লে ভেতরে ঢুকতে দিতে আপত্তি করবে না।'

মোহর বলেছে, 'সারনেমটাই জানি। ফার্স্ট নেমটা বলতে পারব না।'

একটু ভেবে পরমেশ বলেছেন, 'ঠিক আছে, ওতেই হবে। মিস্টার আগরওয়াল নামে অ্যাড্রেস করে লিখছি—'

সেই চিঠি নিয়েই আজ এসেছে মোহর।

কিন্তু দারোয়ানটা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই যে চলে গেছে ; আর ফেরার নাম নেই। মোহর ঘড়ি দেখল। কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। লোকটা কখন ফিরবে কে জানে।

ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মোহর ; অসহিষ্ণুও। কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? সে এধারে ওধারে তাকাতে লাগল। মধ্য কলকাতা এমনিতেই ভীষণ ঘিঞ্জি কিন্তু এই জায়গাটা মোটামুটি নিরিবিলি। চারিদিকে বেশির ভাগই বড় কমপাউণ্ডওলা পুরনো বাড়ি। অন্য সব এলাকার মতো হাই-রাইজের হাওয়াও এখানে এসে লেগেছে। তবে ব্যাপকভাবে নয়, ডানদিকে দু-চারটে মাল্টি-স্টোরিড আকাশের দিকে অসীম স্পর্ধায় মাথা তুলে আছে। দূরে একটা বিরাট বস্তিও চোখে পড়ল।

ছুটির দিনের এই দুপুরে রাস্তায় যে অল্প কিছু লোকজন রয়েছে তারা মোহরের দিকে উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। একটি সুন্দরী তরুণীর এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাটা অবশ্যই কৌতূহলের বিষয়।

মোহরের বিরক্তি ক্রমশ বাড়ছিল। সে যখন ভাবছে গেটের পাশের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে কিনা, সেই সময় দারোয়ান ফিরে আসে। বলে, 'আইয়ে মা'জি—'

মোহর বলতে যাচ্ছিল, এতক্ষণ তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার মানে কী?

কী ভেবে আর বলল না। পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে যে একসময় চমৎকার বাগান, শ্বেত পাথরের পরী, মস্ত ফোয়ারা, নুড়ির রাস্তা, পামগাছের সারি ছিল তা বোঝা যায়। বাগানটা এখন আগাছার জঙ্গল। ফোয়ারার মুখ ভেঙে গেছে। কবে থেকে যে জল বেরুনো বন্ধ হয়েছে কে জানে। পরীটির রং কালচে, সেটার বেদি থেকে পাথর খসে খসে শুকনো শ্যাওলা জমে আছে। পামগাছগুলোর বেশির ভাগই নেই ; যা দু-চারটি টিকে গেছে সেগুলোর হতচ্ছাড়া চেহারা। রাস্তার নুড়িগুলোর খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পেছন দিকে থাম-ওলা প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি। থাম বা দেওয়ালের কোনওটাই অটুট নেই। পলেস্তারা উঠে গিয়ে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে। জানালার খড়খড়ি ভাঙাচোরা। কার্নিসের অনেকটাই উধাও। একতলার গাড়িবারান্দা, দোতলা বা তেতলার ঝুল বারান্দার কোণে কোণে পায়রারা কত কাল ধরে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে ; তাই বা কে বলবে।

যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু ধ্বংসের ছাপ। 'শান্তি ভবন'-এর আয়ু আর কতদিন? মেরামত না করে এই অবস্থায় ফেলে রাখলে বড় জোর বিশ পঁচিশ বছর। তারপর একদিন হুড়মুড় করে ওটা ভেঙে পড়বে।

মোহর লক্ষ করল, বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নিঝুম ; কেমন যেন ভূতে-পাওয়া। মানুষজন দেখা যাচ্ছে না ; পায়রাদের বকম বকম ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা 'শান্তি ভবন'-এর টুটি টিপে ধরে আছে যেন।

এত বড় বাড়ির কোন ঘরে হেমনলিনী রয়েছেন ; আদৌ আছেন কিনা, কে জানে।

পথ প্রদর্শকের মতো আগে আগে চলেছে দারোয়ানটা। তার ডান পা সামান্য ছোট। তাই টেনে টেনে হাঁটছে। কেডস্-পরা বলে চাপা ঘষটানোর মতো একটা শব্দ হচ্ছে। পায়রার ডাকের সঙ্গে এই শব্দটা মিশে গোটা পরিবেশটাকে কেমন যেন ভীতিকর করে তুলেছে।

মোহর খুবই সাহসী মেয়ে কিন্তু তার গা ছমছম করতে লাগল। দারোয়ানটা বাড়ির ভেতর কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে ; তার জানা নেই। এমন একটা দম বন্ধ-করা ধ্বংসস্তূপের মতো বিশাল প্রাসাদে তাকে যদি খুনও করে ফেলা হয় ; বাইরের কেউ টের পাবে না। মোহর একবার ভাবল, পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাবে কিনা। পরক্ষণে মনে পড়ল, পুলিশ কমিশনারের চিঠির কথা

আগরওয়াল নামে অচেনা লোকটাকে জানানো হয়েছে। আর যাই হোক, ক্ষতি করতে সাহস করবে না।

দারোয়ানটা একতলার ডান দিকে বিরাট ড্রইং রুমে মোহরকে নিয়ে এসে বলল, 'মা'জি, আপনি এখানে বসুন। আমি সাহেবকে খবর দিয়ে আসি।'

বাড়িটা বাইরে থেকে ভগ্নস্তূপের মতো দেখালেও ড্রইং রুমটা কিন্তু ঝকঝকে। নতুন সোফা, অ্যাকোয়েরিয়াম, টিভি, বই রাখার সুদৃশ্য ক্যাবিনেট, কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

মোহর খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'শান্তি ভবন'-এর মতো ভাঙাচোরা, প্রাচীন বাড়িতে এরকম সুসজ্জিত একটা ড্রইং রুম দেখবে, সে ভাবতে পারেনি। নিজের অজান্তেই যেন একটা সোফায় নিঃশব্দে বসে পড়ল।

দারোয়ানটাকে আর দেখা গেল না। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর যে ভারী চেহারার, মাঝারি হাইটের লোকটি ড্রইং রুমে এসে ঢুকল তার চুলের বেশির ভাগটাই কালো। কপালে,. মাথার মাঝখানে এবং রগের দিকটায় পাকতে শুরু করেছে। থুতনিটা গোল, চোয়াল চৌকোমতো, জোড়া ভুরু। নীলচে চশমার আড়ালে এক জোড়া ধূর্ত চোখ। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় লোকটা ধুরন্ধর। তার পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবির ওপর দামী গরম চাদর।

মোহর উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার। আমার নাম মোহর দাশগুপ্ত।'

প্রতি নমস্কার জানিয়ে লোকটা পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'আমি প্রবীণ আগরওয়াল। বসুন—'

দু'জনে বসার পর প্রবীণ বলল, 'দারোয়ান বলছিল, আপনি নাকি জরুরি চিঠি নিয়ে এসেছেন। আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেবেন না।'

'হ্যাঁ।'

'কীসের চিঠি? কে লিখেছেন?'

'পুলিশ কমিশনার।'

প্রবীণের চোখেমুখে ভয়ের একটা ছায়া পড়েই দ্রুত মিলিয়ে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'পুলিশ কমিশনার!'

ব্যাগ থেকে চিঠিটা বার করে এবার প্রবীণকে দেওয়া উচিত কিন্তু মোহর দিল না। লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল। পুলিশ কমিশনারের নাম শুনে যেভাবে সে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, মনে হয়, কোথাও একটা গোলমাল আছে। আস্তে মাথা নেড়ে মোহর বলে, 'হ্যাঁ। আগেও বেশ কয়েক বার 'শান্তি ভবন'—এ

এসেছি। ভেতরে ঢুকতে পারিনি। দারোয়ান জানিয়েছে, আপনার বারণ আছে।'

'আজে বাজে লোক এসে বিরক্ত করে। তাই—' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দিল প্রবীণ, 'চিঠিটা দিন মিস দাশগুপ্ত।'

ব্যাগ খুলে চিঠি দিল মোহর। এক নিঃশ্বাসে সেটা পড়ে প্রবীণ বলল, 'আপনি আর আপনার বন্ধু সুদীপ্ত পাইন 'শান্তি ভবন' নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করতে চান। কমিশনার লিখেছেন, আমি যেন আপনাদের সব রকম সাহায্য করি।'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল মোহর।

চিঠিটা টেবলের ওপর রেখে পেপারওয়েট চাপা দিতে দিতে প্রবীণ জিজ্ঞেস করল, 'কমিশনার সাহেব যখন রিকোয়েস্ট করেছেন, কিছু একটা করতেই হবে। আমার কাছে আপনারা কী সাহায্য চান?'

মোহর জানালো তাদের ডকুমেন্টারিটার দুটো অংশ। প্রথমত, বেশ কিছুদিন এ বাড়িতে এসে মল্লিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারপর সেগুলো চিত্রনাট্যের আকারে সাজিয়ে তারা শুটিং করবে। এই দুটো ব্যাপারে 'শান্তি ভবন'-এ তাদের নিয়মিত আসতে হবে।

মোহর বলল, 'আমরা যাতে বিনা বাধায় কাজটা করতে পারি সে জন্যে আপনার কো-অপারেশন দরকার।' একটু থেমে বলল, 'কলকাতার ইতিহাসে মল্লিকদের বিরাট কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্যে এর একটা পার্মানেন্ট, অডিও-ভিসুয়াল ডকুমেন্টেশন করে রাখা উচিত। আপনার সহযোগিতা ছাড়া সেটা একেবারেই অসম্ভব।'

আবেগের সুরে কথাগুলো বলেছে মোহর ; কিন্তু প্রবীণ আগরওয়ালকে খুব একটা বিগলিত দেখাল না। কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে বলল, 'আপনাদের এই কাজটা কমপ্লিট করতে কত দিন সময় লাগবে?'

মোহর বলল, 'শুটিং করতে ম্যাক্সিমাম পাঁচ সাতদিন। তবে তথ্য জোগাড় করাটা ডিপেণ্ড করছে এখানে কতটা কী পাই তার ওপর। অবশ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস, এ-বাড়িতেই বেশির ভাগটা পেয়ে যাব।'

প্রবীণ বলল, 'এখানে বিশেষ কিছু পাবেন বলে মনে হয় না।'

'আগে তো খুঁজে দেখি—'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'নিশ্চয়ই।'

প্রবীণ বলল, 'কমিশনার সাহেব যখন চিঠি দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে

আপনাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে ; তাই না?'

মোহর মাথা নাড়ল, 'আছে।'

'আপনাদের আত্মীয় টাত্মীয় হন?'

'না।'

'তবে?'

কীভাবে পরমেশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হওয়ার পর সম্পর্কটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছে, জানিয়ে দেয় মোহর।

প্রবীণ বল, 'আই সী—'

একটু চুপচাপ।

তারপর প্রবীণ জিজ্ঞেস করল, 'ইনফরমেশন, ডকুমেন্ট—এসব জোগাড় করার জন্য এ বাড়িতে ক'জনকে আসতে হবে?'

মোহর বলল, 'ক'জন আবার? আমি একা, নান এলস।' গোড়া থেকেই সে লক্ষ করেছে, প্রবীণ কেমন যেন একটু আড়ষ্ট, কিংবা সতর্কও বলা যেতে পারে। এই প্রথম সে যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

প্রবীণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কাজটা কবে থেকে শুরু করতে চান মিস দাশগুপ্ত?'

মোহর বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আজ থেকেই।'

প্রবীণ ভেতরে ভেতরে যেন থমকে গেল। খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'আজ অসুবিধা আছে। কাল বাদ দিয়ে পরশু থেকে করলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন তাই হবে।'

এতক্ষণে বোধ হয় প্রবীণের খেয়াল হল, পুলিশ কমিশনারের চিঠি নিয়ে যে এসেছে তাকে আপ্যায়ন করা হয়নি। ব্যস্তভাবে বলল, 'ওই দেখুন, আপনাকে চা দেবার কথা একেবারে ভুলে গেছি। কী আনাব—চা, না কফি?'

মোহর বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ। কিছু দরকার নেই আগরওয়াল সাহেব। এখানে আসার ঠিক আগেই আমি লাঞ্চ খেয়েছি। এখনও এক ঘণ্টা পার হয়নি।'

প্রবীণ কিন্তু কোনও কথা শুনল না। একটা কাজের লোককে ডেকে চা, কেক, কাজু বাদাম আনাল।

আপত্তি করে লাভ নেই। নিঃশব্দে চায়ের কাপটাই শুধু তুলে নিল মোহর।

প্রবীণও খুব সম্ভব তাকে সঙ্গ দেবার জন্য চা নিল। হালকা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'মিস দাশগুপ্ত, ইতিহাস টিতিহাস আমি ভাল বুঝি না। এম.কম পাশ করার

পর গারমেন্টের ব্যবসা করছি। তথ্য জোগাড়ের কাজটা কীভাবে আরম্ভ করবেন সেটা জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে।'

প্রবীণের মুখ দেখে কৌতূহলটা কতখানি সরল এবং মারপ্যাঁচহীন বোঝা গেল না। মোহর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথমে 'শান্তি ভবন'-এর শেষ জীবিত বংশধর হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বংশের ইতিহাস শুনব।'

প্রবীণ রীতিমত হকচকিয়ে যায়, 'হেমনলিনী মল্লিকের কথা কার কাছে শুনেছেন?'

'আমার বন্ধু সুদীপ্ত, মানে যে এই ডকুমেন্টারিটা করতে চায় তার কাছে।'

'তিনি জানলেন কীভাবে?'

'কারও কাছে শুনে থাকবে। কিংবা কাগজে পাবলিশড কোনও একটা লেখায় পড়ে থাকতে পারে। আমি এগ্‌জাক্টলি বলতে পারব না। আসলে ওকে জিজ্ঞেস করিনি।'

প্রবীণ চুপ করে থাকে।

মোহর এবার বলে, 'যদি বলেন সুদীপ্তকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাতে পারি।'

প্রবীণ বলল, 'না না, তার দরকার নেই। কিন্তু—'

'বলুন—'

'হেমনলিনী দেবী ভীষণ অসুস্থ। শয্যাশায়ীই বলতে পারেন। কথা বলতে ওঁর ভীষণ কষ্ট হয়। এই অবস্থায়—মানে বুঝতেই পারছেন—'

মোহর বলল, 'একটানা ওঁকে দিয়ে বকাবো না। রোজ পনের কুড়ি মিনিট করে বললেই হবে। সময় একটু বেশি লাগবে। তা আর কী করা যাবে।'

প্রবীণ নিরুৎসুক সুরে বলল, 'ঠিক আছে।'

'আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। আজ তা হলে যাওয়া যাক। পরশু কখন এলে আপনাদের অসুবিধে হবে না?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মোহর।

প্রবীণও উঠে পড়েছিল। বলল, 'দুপুরবেলা উনি বিশ্রাম করেন। হয় সকালের দিকে আসুন ; ধরুন ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ। নইলে বিকেলে পাঁচটার পর।'

'আচ্ছা—' দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়ায় মোহর। বলে, 'ক্ষমা করবেন, একটা ব্যাপার জানতে চাইলে অনধিকার চর্চা মনে করবেন কিনা বুঝতে পারছি না।'

'কী বলুন তো?'

'মল্লিকবাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী?'

মুহূর্তের জন্য থতিয়ে যায় প্রবীণ। পরক্ষণে বেশ সপ্রতিভভাবে বলে ওঠে, 'হেমনলিনী দেবী আমার মা।'

মোহর চমকে উঠল। মল্লিকের ছেলের পদবি আগরওয়াল হয় কী করে সে ভেবে পেল না। অবশ্য জামাইদের কাছে শাশুড়িরা মাতৃসমা। হেমনলিনীর মেয়ে যদি আগরওয়ালকে বিয়ে করে থাকে? আজকাল তো আকছার বাঙালির সঙ্গে আবাঙালির বিয়ে হচ্ছে। তক্ষুণি খেয়াল হল, হেমনলিনী নিঃসন্তান বিধবা। সুদীপ্ত বলেছিল, পৃথিবীতে তাঁর রক্তের সম্পর্কে আপনজন কেউ নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা মোহরের মাথার ভেতর কেমন যেন গুলিয়ে গেল। কিন্তু এই নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হল না। পরশু থেকে সে তো নিয়মিত আসছেই। রহস্যটা ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুই

'শান্তি ভবন' থেকে বেরিয়ে সোজা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বিপিন পাল রোডে সুদীপ্তর 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ চলে এল মোহর। এটা ওর প্রোডাকশনের অফিস।

অফিসটা খুবই ছোট। দোতলায় সাড়ে চার শ স্কোয়ার ফিটের মতো ছোট ফ্ল্যাটে মাত্র দুটো ঘর। একটা বেশ বড়, অন্যটা মাঝারি। সেই সঙ্গে টয়লেট, কিচেনেট আর চওড়া প্যাসেজ। গোটা অফিসটা চমৎকার সাজানো গোছানো। তাছাড়া এয়ারকুলার বসিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বড় ঘরটায় ছবি এডিট করার জন্য দু সেট করে এডিটিং কনসোল বসিয়েছে সুদীপ্ত। সেগুলোর প্রচুর সরঞ্জাম। প্রতিটির সঙ্গে তিনটে করে ভিসিআর, তিনটে করে মনিটর, কনট্রোল বোর্ড, স্পেশাল এফেক্টের জন্য মেশিন, সাউণ্ড মিক্সার ইত্যাদি। একটা দামী ইউমেটিক ক্যামেরাও কেনা হয়েছে। সেটাও ওই ঘরেই থাকে।

তুলনায় ছোট ঘরটা হল আসল অফিস। সেটা কাচের দেওয়াল তুলে দু'ভাগ করা। একদিকে বসে অ্যাকাউনটেন্ট রাজেশ সান্যাল আর অফিস অ্যাসিস্টান্ট প্রদীপ রাহা। 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ ক্যামেরা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যা আছে, সুদীপ্তদের প্রোডাকশনের জন্য সবসময় অত দরকার হয় না। তাই বসিয়ে না রেখে ওগুলো প্রায়ই বাইরের প্রোডিউসারদের ভাড়া দেওয়া হয়। প্রদীপ এই

দিকটা দেখে। ঘরের অন্য অংশটায় বসে সুদীপ্ত এবং তার ইউনিটের লোকজন। এখানে মোহরের জন্য একটা গদি- মোড়া চেয়ার আর টেবল আছে। সে যখন আসে ওখানেই বসে।

দুটো ঘরের সামনে দিয়ে যে প্যাসেজটা চলে গেছে তার শেষ মাথায় রিসেপশানিস্টের ডেস্ক। সব মিলিয়ে 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ আট দশজন এমপ্লয়ী।

সুদীপ্ত ডকুমেন্টারি টকুমেন্টারি করে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রচুর ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে এই সব ক্যামেরা ট্যামেরা বসিয়েছে। বাইরের অজস্র কাজ পাচ্ছে 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'। ওদের ক্যামেরা আর এডিটিং কনসোল একদিনও বসে থাকে না। দু শিফট তো বটেই, কোনও কোনও দিন তিন শিফটেও ওগুলো ভাড়া খাটে। সুদীপ্তর ধারণা, চার বছরের মধ্যেই তার সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

মোহর কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রিসেপশানিস্ট মেয়েটি, যার নাম পল্লবী—মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ভেতরে যান মোহরদি। সুদীপ্তদা আপনার জন্যে ওয়েট করছেন।' তার সঙ্গে সুদীপ্তর কী সম্পর্ক, মেয়েটা তা জানে।

নিঃশব্দে একটু হেসে বাঁ দিকের ঘরটায় ঢুকতেই মোহর দেখতে পেল, সুদীপ্ত একাই বসে আছে। তার সামনে আধখানা বৃত্তের আকারে মাঝারি সাইজের টেবলে টেলিফোন, রাইটিং প্যাড, পেন-স্টাণ্ডে বেশ কয়েকটা কলম, পেপার ওয়েট এবং অনেকগুলো ফাইল। টেবলের এধারে যে চারখানা চেয়ার রয়েছে সেগুলো এখন ফাঁকা। সুদীপ্তর পেছন দিকের দেওয়ালে সুদৃশ্য কাচের ক্যাবিনেটে প্রচুর ফিল্ম স্ক্রিপ্ট, ক্যাসেট এবং চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা অজস্র বই আর ম্যাগাজিন সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

সুদীপ্তর বয়স বত্রিশ। পেটানো স্বাস্থ্য তার, রং বাদামী, চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ করা ঘন চুল, গালের দাড়ি সযত্নে ছাঁটা। দু'চোখে আশ্চর্য এক স্বপ্নময়তা যেন মাখানো। পরনে ফেডেড জিনস্ আর পুরু কটনের শার্টের ওপর হাত-কাটা মেরুন রঙের সোয়েটার।

ডান পাশে কাচের দেওয়াল ঘেঁষে মোহরের টেবল চেয়ার। সে কিন্তু ওদিকে না গিয়ে সুদীপ্তর সামনে এসে কাঁধ থেকে ঢাউস ব্যাগটা নামিয়ে ওর মুখোমুখি বসে পড়ল।

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'আজ কী হল? অভিযান সাকসেসফুল?'

মোহর বলল, 'কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সুদীপ্ত সামনের দিকে ঝুঁকে অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'মানে? পরমেশদার চিঠিতে কাজ হয়নি?'

মোহর বলল, 'অত ইমপেশেন্ট হয়ো না। খানিকটা এগুতে নিশ্চয়ই পেরেছি। আগরওয়াল আজ আর গেটের বাইরে থেকে ভাগাতে পারেনি; দারোয়ান দিয়ে ভেতরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক রকম জেরাটেরা করল ; ক্রিমিনাল ল'ইয়ারদের ক্রস একজামিনেশানের মতো ব্যাপারটা।'

'আসল কাজটার কিছু হয়েছে?'

'নো স্যার। হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। উনি নাকি ভীষণ অসুস্থ, বেড-রিডন। এই সব বলে আগরওয়াল দেখা করতে দেয়নি। তবে—'

'তবে কী?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি। পরশু দিন সকালে হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সুদীপ্ত, 'মনে হচ্ছে, কোনও কারণে আগরওয়ালকে তুলি সন্দেহ করছ।'

মোহর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'রাইট। আগরওয়াল লোকটা কেমন যেন সাসপিসাস টাইপ। বললে, হেমনলিনী তার মা। 'শান্তি ভবন'-এ ও কী করে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, বুঝতে পারছি না।'

একটু ভেবে সুদীপ্ত বলল, 'আজ ওখানে যাবার পর যা যা হয়েছে, আগরওয়াল এগ্‌জাক্টলি তোমাকে কী বলল, ডিটেলে সব বল তো। কিছু বাদ দেবে না।'

মোহর আগাগোড়া সমস্ত বলে গেল।

শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুদীপ্ত। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক। লোকটা সাসপিসাসই।'

মোহর জিজ্ঞেস করল, 'পরমেশদাকে বোধহয় জানানো দরকার।'

'এখন থাক। আগরওয়াল তো বলে নি হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। পরশু যাও। তখন যদি টালবাহানা করে, পরমেশদাকে জানাতেই হবে।'

'আচ্ছা—'

ইন্দ্রজিৎ এসে ঢুকল। সে সুদীপ্তর ফার্স্ট অ্যাসিস্টান্ট। বয়সে ওর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এসসি পাশ করার পর সুদীপ্তর ইউনিটে জয়েন করেছে। 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান-এর একেবারে শুরু থেকেই সে

আছে। ফিল্ম ছাড়া কিছু বোঝে না। সিনেমার সমস্ত ডিপার্টমেন্ট—ক্যামেরা, এডিটিং, স্ক্রিপট, আর্ট ডিরেকশন ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা খুব পরিষ্কার। তা ছাড়া প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ। ওকে ছাড়া প্রোডাকশনের ব্যাপারে একটা পাও এগুনো সুদীপ্তর পক্ষে সম্ভব নয়।

চেয়ারে বসতে বসতে ইন্দ্রিজিৎ বলল, 'কী মোহরদি, মল্লিক বাড়ির ব্যাপারে আশার আলো কিছু দেখা গেল?' মোহর যে 'শান্তি ভবন'-এ প্রায়ই যাচ্ছে এবং আজও গিয়েছিল সেটা তার জানা।

মোহর হেসে বলল, 'তাই নিয়েই সুদীপ্তর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সব ঠিকঠাক চললে এক-দেড় মাসের মধ্যে তথ্য জোগাড় হয়ে যাবে। অবশ্য পরশু দিনটা না দেখে জোর দিয়ে বলতে পারছি না।'

পরশু দিনটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আর জিজ্ঞেস করল না ইন্দ্রিজিৎ। শুধু বলল, 'রিসার্চ ওয়ার্কেই যদি দেড় মাস কেটে যায়, তারপর স্ক্রিপ্ট লিখতে আরও পনেরো কুড়ি দিন। মল্লিকবাড়ির পরও দশ বারোটা ইমপর্টেন্ট বাড়ি সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করে চিত্রনাট্য লিখে শুটিংয়ের কাজ কবে শুরু হবে কে জানে। ততদিন কি আমাদের প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে থাকবে?'

আসলে কাজের ব্যাপারে সুদীপ্ত ভীষণ খুঁতখুঁতে ধরনের। যাদের পারফেকশানেস্ট বলে সে অনেকটা তাই। শুধু পয়সার জন্য দায়সারাভাবে কিছু করতে চায় না। বনেদি বাড়িগুলো নিয়ে ডকু-ফিচারের অফারটা পাওয়ার পর নিজেদের প্রোডাকশনের অন্য সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সে। মোহর আগেই কুড়িটা প্রাচীন অভিজাত বংশের ইতিহাস জোগাড় করে তার সঙ্গে বসে চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছে। বাকি আছে আরও বারোটা বাড়ি। তার মধ্যে মল্লিকবাড়ি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই বারোটা বাড়ির ওপর রিসার্চ শেষ হলে পেপারওয়ার্ক কমপ্লিট করে একটানা ডকু-ফিচারটার শুটিং করার ইচ্ছা সুদীপ্তর। প্রথম দফায় কুড়িটা, কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে আবার বারোটা, এভাবে আধাখেঁচড়া পরিকল্পনাহীন কাজ তার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু ইউনিটের লোকেরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে ; তারা আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নয়।

মোহর বলল, 'আমাকে বলে কী হবে? সুদীপ্তকে বল।'

সুদীপ্ত ইন্দ্রজিৎকে বলল, 'তোরা তো জানিস, আমার ওয়ান ট্র্যাক মাইণ্ড। যে কাজে হাত দিই সেটা শেষ না করে অন্য কিছু ভাবতে পারি না।'

ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারছিল বনেদি বাড়ির ব্যাপারটা ছাড়া এই মুহূর্তে সুদীপ্তর মাথায় অন্য কোনও পরিকল্পনা নেই। সে চুপ করে রইল।

এই সময় ক্যামেরা ম্যান দীপঙ্কর, এডিটর স্বপন আর সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট প্রদ্যোৎ এসে পড়ল। এরা সকলেই সুদীপ্তর প্রায় সমবয়সী। দু-এক বছর কম-বেশি হতে পারে। স্টুডিও বা অন্য লোকেশনে শুটিং না থাকলে এই সময়টা ইউনিটের সবাই 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ চলে আসে। সন্ধে পর্যন্ত কাজের কথার ফাঁকে ফাঁকে তুমুল আড্ডা চলে।

এখানকার কিচেনেটে চা, কফি আর টোস্ট-ওমলেট করার ব্যবস্থা আছে। অফিসের একমাত্র বেয়ারা দুলালই সে সব করে থাকে। তাকে ডেকে কয়েক কাপ ব্ল্যাক কফি দিতে বলল সুদীপ্ত।

দীপঙ্কররা মোহরের কাছে জানতে চাইল, হেমনলিনীর সঙ্গে সে দেখা করতে পেরেছে কিনা। কেননা এই দেখা হওয়াটার ওপর তাদের কাজকর্ম শুরু হওয়া নির্ভর করছে।

হেমনলিনী প্রসঙ্গে সুদীপ্ত আর ইন্দ্রজিৎকে যা বলেছিল, দীপঙ্করদেরও তাই বলল মোহর।

কফি এসে গিয়েছিল। একটা কাপ তুলে লম্বা চুমুক দিয়ে দীপঙ্কর বলল, 'ওই হারামজাদা আগরওয়ালটাকে খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। ব্লাডি রাসকেলটার নিশ্চয়ই কোনও ধান্দা আছে।' বলে বাছা বাছা আরও কিছু গালাগাল দিল।

দীপঙ্কর মানুষ খুব ভাল, কিন্তু মুখটা ভীষণ খারাপ। দেখা গেল আগরওয়াল সম্পর্কে তার সঙ্গে সবাই একমত।

দীপঙ্কর এবার বলল, 'কবে মোহর মল্লিক বংশের হিস্ট্রি ফিস্ট্রি জোগাড় করতে পারবে ভগবান জানে। সুদীপ্ত, তোমাকে স্ট্রেট একটা কথা বলছি—'

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'উই আর অল প্রফেসনালস। এভাবে চুপচাপ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে বাতে ধরে যাবে। মোহর ওই শালা আগরওয়ালের পেছনে অ্যাডহেসিভের মতো সেঁটে থাক। মল্লিক ডাইনেস্টির ইতিহাস ফিতিহাস কালেক্ট করতে পারলে বনেদি বাড়ির ডকু-ফিচারটা পরে শুরু করা যাবে। কলকাতার বাঈজি আর রেডলাইট এরিয়া নিয়ে ডকুমেন্টারি করার জন্য ফ্রেঞ্চ টিভি আমাদের সঙ্গে যে কনট্রাক্ট করেছে, সে দুটো বরং আগে করে ফেলি।'

বাকি সকলে দীপঙ্করের কথায় সায় দিল। এডিটর স্বপন বলল, 'ওগুলোর স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত হয়ে গেছে। এখন লোকেশন দেখে আরম্ভ করে দিলেই হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুদীপ্ত। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আর দু-চারটে দিন দেখি। যদি বুঝি মল্লিকবাড়ির ব্যাপারটা দেরি হয়ে যাবে, তখন না

হয় ফ্রেঞ্চ টিভির ডকুমেন্টারি দুটোয় হাত দেবো।'

সবাই খুব খুশি হল। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট প্রদ্যোৎ বলল, 'মল্লিক বাড়ির জন্যে ক'দিন ওয়েট করতে চাইছ?'

সুদীপ্ত বলল, 'পরশু মোহর 'শান্তি ভবন'-এ যাচ্ছে। ও ফিরে এলে বলতে পারব।'

বোঝা গেল, হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে মোহরের দেখা না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী প্রোজেক্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চায় না সুদীপ্ত। প্রদ্যোৎ বলল, 'অলরাইট, পরশুই বলো। আশা করি সেদিনই আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে যাবে।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে একে একে সবাই চলে গেল। রইল শুধু সুদীপ্ত আর মোহর।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। কাচের জানালা দিয়ে দেখা গেল বাইরের রাস্তায় এবং চারপাশের বাড়িগুলোতে অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। অল্প দূরে ল্যান্সডাউন রোডে অসংখ্য মানুষ এবং গাড়ির স্রোত। এয়ার-কণ্ডিশানড অফিসের জানালায় কাচ বসানো থাকায় কোনও শব্দ কানে আসছে না। এই সন্ধেবেলায় কলকাতাকে নিঝুম অথচ গতিময় এক যাদুনগরী বলে মনে হচ্ছে।

আজ খাওয়া দাওয়ার পর মোহর যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে ওর মা ওকে একটা কথা বলেছিলেন। আসলে কথাটা তিনি কয়েকদিন ধরেই বলছেন। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুলে নানা কাজের চাপে স্রেফ ভুলে যাচ্ছে। এখন সুদীপ্তর সামনে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সেটা মনে পড়ে গেল।

মোহর জিজ্ঞেস করল, 'এখন তোমার কোনও আর্জেন্ট কাজ আছে?'

সুদীপ্ত মজার গলায় বলল, 'না, বিলকুল বেকার। ভাবছিলাম ভিসিআর চালিয়ে একটা পোলিশ ছবি দেখে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেবো।'

খানিকটা দ্বিধান্বিতভাবে মোহর বলল, 'ছবিটা পরে একদিন দেখলে চলবে না?'

'নিশ্চয়ই চলবে।'

'তা হলে উঠে পড়।'

'মানে?'

'আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।'

একটু অবাক হয়ে সুদীপ্ত বলল, 'কোথায়?'

মোহর বলল, 'আমাদের বাড়ি। মা ক'দিন ধরে তোমাকে নিয়ে যাবার কথা

বলছে ; আমার একেবারে মনে থাকছে না। আজ না নিয়ে গেলে ভীষণ রেগে যাবে।'

'ভাবী মাদার-ইন-ল'র এমন জরুরি তলব কেন?'

'বলতে পারব না।'

'ওক্কে। চল—'

'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এর নিজস্ব একটা মারুতি ভ্যান আর একটা জিপ আছে। অফিস থেকে বেরিয়ে মারুতি ভ্যানে মোহরকে তুলে ভবানী-পুরের দিকে চালিয়ে দিল সুদীপ্ত।

তিন

হরিশ মুখার্জি রোডে মোহরদের পুরনো ধাঁচের ছোট দোতলা বাড়ির সামনে মারুতি ভ্যানটা পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেল। রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করে দু'জনে নেমে পড়ল।

মোহর কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন তার মা চারুশীলা। তাঁর বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। রোগা, ফর্সা, ডিম্বাকৃতি মুখ। এই বয়সেও বেশ সুশ্রী। তবে বোঝা যায়, সংসারের বহু ঝড় ঝাপটা তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

মোহর যে তাঁর মেয়ে সেটা দু'জনকে দেখলেই টের পাওয়া যায়। মায়ের মুখশ্রীটা সে পুরোপুরিই পেয়েছে।

সুদীপ্তকে দেখে খুশি হলেন চারুশীলা। হাসিমুখে বললেন, 'এসো-এসো।'

গোটা বাড়িটা নিয়েই মোহররা থাকে। তাদের ছোট্ট ফ্যামিলি। মা, সে আর তার দিদি নন্দিতা—সবসুদ্ধ তিনজন।

বাড়িটার একতলায় তিনখানা ঘর, ওপরে দু'খানা। নিচে কিচেন, ড্রইং রুম, খাওয়ার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি। দোতলার দুটো বেডরুমের একটা চারুশীলার, অন্যটা নন্দিতা আর মোহরের। রান্নাবান্নার জন্য একজন মাঝবয়সী মহিলা আছে এ বাড়িতে। তার নাম কমলা। সে থাকে নিচের তলার একটা ঘরে।

অন্য কেউ এলে ড্রইং রুমে বসানো হয় কিন্তু সুদীপ্তর ব্যাপারটা আলাদা। যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হতে চলেছে তার সঙ্গে তো বাইরের লোকের মতো ব্যবহার করা যায় না। সে এলে তাকে ওপরে নিজের ঘরে নিয়ে যান চারুশীলা।

সুদীপ্ত আর মোহরকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে গলার স্বর উঁচুতে তুলে চারুশীলা বললেন, 'সুদীপ্ত এসেছে কমলা।'

এইটুকুই যথেষ্ট। সুদীপ্ত এলে কী করতে হবে সেটা কমলার জানা আছে।

রান্নাঘরে খুটখাট করে কী যেন করছিল সে ; সেখান থেকে সাড়া দিল, 'দাদাবাবুকে দেখেছি। আধ ঘণ্টার ভেতর লুচি ভেজে নিয়ে যাচ্ছি।'

দোতলায় দু'খানা বেডরুমই বেশ বড়। চারুশীলার ঘরের একধারে কারুকাজ-করা, প্রকাণ্ড ভারী খাট। তা ছাড়া রয়েছে আলমারি, ড্রেসিং টেবল, গদিমোড়া ইজিচেয়ার, বেতের মোড়া, সোফা ইত্যাদি। সবই সেকেলে ডিজাইনের। এক কোণে উঁচু স্ট্যাণ্ডে লাল রঙের টেলিফোন।

ঘরে ঢুকে চারুশীলা বললেন, 'বসো।'

সুদীপ্ত ইজি চেয়ারে বসে পড়ল। মোহর বসল মায়ের খাটে আর চারুশীলা একটা মোড়া টেনে নিলেন।

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'নন্দুদিকে দেখছি না তো?'

মোহরের দিদি নন্দিতার ডাক নাম নন্দু।

চারুশীলা বললেন, 'ওর নার্ভের পেইনটা ভীষণ বেড়েছে। তাই বিমলকে ফোন করে আনিয়ে বিকেলে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে।'

বিমলকে চেনে সুদীপ্ত। সে মোহরের দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। ইকনমিকস নিয়ে এম. এ পড়ছে। এটাই তার ফাইনাল ইয়ার। ছেলেটা খুবই ভাল। যথেষ্ট মায়ামমতা তার। চারুশীলার কোনও দরকারে ডাকলে তক্ষুণি ছুটে আসে। ওর ওপর এ বাড়ির সবাই অনেকটা নির্ভর করে।

মোহরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর এখানে যাতায়াত করছে সুদীপ্ত। নন্দিতাকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তার। মেয়েটার নানারকম রোগ। বারোমাস শরীর নিয়ে একটা না একটা সমস্যা। কিডনির প্রবলেম, প্রচণ্ড রকমের লো প্রেসার, মাথার যন্ত্রণা, পাইলস, চোখের অসুখ—কী নেই ওর? একটা একটু কমে তো, অন্যটা চাড়া দিয়ে ওঠে। অনবরত ভুগে ভুগে কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

দারুণ ছাত্রী ছিল নন্দিতা। কিন্তু এত ভুগলে রেজাল্টটা কী করে আর ভাল হবে? কোনও রকমে পাস কোর্সে বি. এ'টা পাশ করে চুপচাপ বসে আছে। এম. এ যে করবে তার উপায় নেই। পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে আজকাল চাকরি পাওয়ার উপায় নেই। এদের পক্ষে কোনও ইউনিভার্সিটিতে এম. এ করার সুযোগ হয় না। এম. এ পড়তে গেলে অনার্সটা থাকা চাই।

চারুশীলা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়ির সবাই ভাল তো?'

সুদীপ্ত বলল, 'মাঝখানে বাবার হার্টের একটু ট্রাবল হয়েছিল। ইসিজি করানো হয়েছে, ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, এখন ঠিক আছেন।'

চারুশীলা জানেন, বাবা-মা, দুই দাদা, দুই বৌদি চার পাঁচটা ভাইপো ভাইঝি নিয়ে সুদীপ্তদের একান্নবর্তী, সুখী পরিবার। কোনও রকম ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষি বা তিক্ততা নেই। পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার। এমন যৌথ পরিবার আজকাল আর চোখেই পড়ে না।

সুদীপ্তর বাবার সম্বন্ধে জানা হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরও নিলেন চারুশীলা।

কমলা বড় ট্রেতে মোহর আর সুদীপ্তর জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, ফুলকপির তরকারি এবং সন্দেশের প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এল। এ সময় চারুশীলা কিছু খান না, তাই তাঁর জন্য আনে নি। একটা নিচু টেবল সুদীপ্তর সামনে টেনে এনে তার ওপর ট্রেটা রাখতে রাখতে কমলা বলল, 'ছোটদি, দাদাবাবু, আপনারা খেতে থাকুন। আমি চা করে আনছি।'

সুদীপ্ত খাওয়া শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল, শুধু তাদের বাড়ির খবর নেবার জন্য চারুশীলা তাকে ডাকিয়ে আনান নি। কুশল প্রশ্ন ছাড়াও তাঁর জরুরি কিছু বলার আছে। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় চারুশীলা আস্তে ডাকলেন, 'সুদীপ্ত—'

সুদীপ্ত মুখ তুলে তাকায়।

চারুশীলা বললেন, 'আমার রিটায়ারমেন্টের আর বছর দুই বাকি। আমার খুব ইচ্ছে তার আগেই মোহরের সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক।'

সুদীপ্ত চুপ করে রইল।

চারুশীলা এবার বললেন, 'বুঝতেই পারছ, আমার বয়স হয়েছে। মাথার ওপর কোনও পুরুষমানুষ নেই। মোহরের বিয়েটা হয়ে গেলে খানিকটা অন্তত দায়মুক্ত হতে পারব।'

চারুশীলার দুশ্চিন্তার কারণটা অজানা নয়। সুদীপ্ত শুনেছে, মোহরের যখন দশ বছর বয়স আর নন্দিতার বারো, সেইসময় বাস অ্যাকসিডেন্টে তাদের বাবা মারা যান। চারুশীলার শ্বশুরবাড়ির দিকের এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁদের দায়িত্ব নিতে পারেন। তবে তাঁর বাবা এবং দুই দাদা তখনও জীবিত। তাঁরা অবশ্য নিজেদের কাছে ওঁদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চারুশীলার আত্মসম্মান বোধ খুবই প্রখর ; সেই সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধিও। শোকের সময় আবেগের বশে মানুষ অনেক কিছু বলে বা করে বসে। পরে হয়তো দেখা যাবে তাঁরা বাবা এবং দাদাদের

বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভবিষ্যৎ অশান্তি বা তিক্ততার কথা ভেবে চারুশীলা বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন নি। ওঁদের বলেছিলেন, 'তোমরা তো রইলেই। চেষ্টা করে দেখি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কিনা। না পারলে তোমাদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।' বাবা আর ভাইরা খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে নড়ানো যায়নি।

বিয়ের আগে বি.এ' টা পাশ করা ছিল চারুশীলার। ডিগ্রিটা এই সময় তাঁর খুব কাজে লেগে গিয়েছিল। মোহর আর নন্দিতার বাবা যে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন মাস দেড়েক সেখানে ছোটাছুটি করার পর চাকরি পেয়েছিলেন। ইউনিয়ন এবং ব্যাঙ্কের অফিসাররা এ ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তা না হলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতেন না।

চাকরি করে দুই মেয়েকে মানুষ করেছেন চারুশীলা। এখন ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ দুর্ভাবনায় আছেন।

সুদীপ্ত কিছুদিন ধরে লক্ষ করছে, চারুশীলার মাথায় মৃত্যুচিন্তা ভর করেছে। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, নিজের বয়সের কথা বলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সমানে যুদ্ধ করে চলেছেন। এখন তিনি ভীষণ ক্লান্ত, জীবনীশক্তি দ্রুত ক্ষয় হয়ে আসছে।

সুদীপ্ত বলল, 'মোহরের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক বার কথা হয়েছে। ওর ইচ্ছে কলেজের লেকচারশিপ বা অন্য কোনও চাকরি টাকরি পাওয়ার পর বিয়েটা হোক।'

চারুশীলা বললেন, 'চাকরি তো আজকাল চট করে পাওয়া যায় না। ধর, অনেক দেরি হয়ে গেল। ততদিন—'বলতে বলতে থেমে গেলেন।

সুদীপ্ত বলল, 'মোহরের ধারণা যা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়িই কিছু একটা পেয়ে যাবে।'

চারুশীলা চুপ করে রইলেন।

তাঁর মনোভাব বুঝতে পারছিল সুদীপ্ত। কিন্তু হাজারটা কাজের মধ্যে জড়িয়ে গেছে সে। মোহরের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিকই করে রেখেছিল খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে বিয়েটা করবে। সব ব্যাপারেই সে পারফেকশানিস্ট থাকতে চায়। বিয়েটা জীবনের একটা বিরাট ঘটনা। যেভাবে ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে সযত্নে একটা সিরিয়াল বা ডকুমেন্টারি সে তৈরি করে, ঠিক সেইভাবে, তাড়াহুড়ো না করে, অনেক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে বিয়েটা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব হবে না। চারুশীলাকে আজকের মতো এত অস্থির হতে আগে আর কখনও

দেখে নি সুদীপ্ত। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আপনার কথা মা-বাবা দাদাদের বলব।'

গভীর আগ্রহে চারুশীলা বলেন, 'তুমি আগে বল, তারপর আমি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর চারুশীলা বললেন, 'আমি কেন তাড়া দিচ্ছি জানো?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সুদীপ্ত ; কিছু বলল না।

চারুশীলা বললেন, 'আসলে মোহরের জন্যে ততটা নয়, নন্দুর জন্যে ভেবে ভেবে আমি সারারাত ঘুমোতে পারি না।'

তিনি ঠিক কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে সুদীপ্ত।

চারুশীলা এবার বলেন, 'তোমার কাছে বিশেষ একটা অনুরোধ আছে বাবা।'

সুদীপ্ত বলল, 'বলুন—'

'নন্দুটার এত রোগ! কে ওকে বিয়ে করবে? আমি যতদিন আছি, আগলে আগলে বাখব। কিন্তু আমি চোখ বুজলে?' চারুশীলা একটানা বলে যান, 'তুমি আমার জামাই হলে একটা দাবি করতে পারি, বলতে পারি আমার মৃত্যুর পর তোমরা ওকে দেখো।'

এতক্ষণে চারুশীলার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। আসলে মোহরের চেয়ে অসুস্থ, চিররুগ্ন নন্দিতার জন্য তিনি অনেক বেশি চিন্তিত। সুদীপ্তর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক না হলে তার ওপর তো মেয়েটার দায়িত্ব দেওয়া যায় না।

সুদীপ্ত কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বলল, 'এই কারণে বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন? বিয়েটা যখনই হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নন্দুদির সব রেসপনসিবিলিটি আমাদের। আপনার অবর্তমানে ওর যাতে কোনওরকম কষ্ট না হয় সেটা আমরা দেখব।'

কৃতজ্ঞ সুরে চারুশীলা বললেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে বাবা।'

এতক্ষণ নিঃশব্দে দু'জনের কথা শুনে যাচ্ছিল মোহর। এবার ক্ষোভের গলায় বলল, 'আমাদের কী ভাবো বল তো! তুমি চলে গেলে দিদিকে ফেলে দেবো! এ সব চিন্তা তোমার মাথায় এল কী করে?'

বিব্রতভাবে চারুশীলা কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর গলায় স্বর ফোটে না।

চার

মাঝখানে একটা দিন বাদ দিয়ে আজ আবার 'শান্তি ভবন'-এ এল মোহর। এখন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা।

গেটের পাশে সেই ছোট দরজাটার কাছে যথারীতি টুলের ওপর বসে আছে দারোয়ানটা। সে যেন এ বাড়ির বিরাট বিরাট পিলার, ভাঙা পরী, দেওয়াল, কার্নিস বা শ্বেত পাথরের সিঁড়ির মতো অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ। যখনই আসা যাক না, দরজার ওধারে তাকে দেখা যাবেই।

দারোয়ান আজ আর টালবাহানা করল না। মোহরকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল। বলল, 'নমস্তে মা'জি, আইয়ে—' জানালো, প্রবীণ আগরওয়াল তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এত সহজে যে আজ 'শান্তি ভবন'-এ ঢোকা যাবে ; ভাবতে পারেনি মোহর। মনে হচ্ছে পুলিশ কমিশনারের চিঠিটায় ভালই কাজ হয়েছে। হেমনলিনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে না দিলে যে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আগরওয়াল।

দারোয়ান মোহরকে সঙ্গে করে আগের দিনের সেই ড্রইং রুমটায় নিয়ে এল। সত্যিই সেখানে বসে ছিল আগরওয়াল। আপ্যায়নের সুরে বলল, 'বসুন মিস দাশগুপ্ত।' মোহর একটা সোফায় বসলে বলল, 'মাকে আপনার কথা বলেছি। উনি দেখা করতে রাজী হয়েছেন। তবে বেশি সময় দিতে পারবেন না। বুঝতেই পারছেন, ভীষণ অসুস্থ তো—'

আগরওয়াল হেমনলিনীকেই যে মা বলছে সেটা বোঝা গেল। মোহর বলল, 'সেদিনই আপনাকে জানিয়েছি, পনেরো কুড়ি মিনিটের বেশি কোনওদিনই ওঁকে কথা বলতে দেবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'মল্লিক বংশের পাস্ট মানে অতীত নিয়ে যত খুশি প্রশ্ন করবেন। তবে বর্তমান নিয়ে কোনও কথা নয়।'

মোহরের মনে সংশয়ের ছায়া পড়ল। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো? হেমনলিনী দেবীর জীবনে প্রেজেন্ট টেন্স বলে কি কিছুই নেই?'

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে ওঠে আগরওয়াল। শশব্যস্তে বলে, 'নিশ্চয়ই আছে। তবে তা নিয়ে জানতে চাইলে খেপে যান। তাই ওটা অ্যাভয়েড করাই উচিত।'

'খেপে যান কেন?'

'খুব সম্ভব এই সময়টাকে তাঁর ভাল লাগে না। মায়ের ধারণা, এখনকার সব কিছুই খারাপ। পাস্ট গ্লোরি, মানে অতীত গৌরবের স্মৃতি নিয়েই তিনি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান।'

মোহর ভাবল, তাদের ডকু-ফিচারটা বনেদি বাড়িগুলোর অতীত এবং বর্তমান, দুই সময়কে নিয়েই। বর্তমানকে বাদ দিলে ওটায় খুঁত থেকে যাবে। কিন্তু আগরওয়াল চায় না, এই সময় নিয়ে হেমনলিনীকে সে কোনও প্রশ্ন করুক। যে কারণটা সে খাড়া করেছে সেটার মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। বর্তমান সম্পর্কে হেমনলিনীর ক্ষোভ থাকতে পারে কিন্তু তাকে অস্বীকার করবেন কেন? আগরওয়াল লোকটাকে পরশু দিনের মতো আজও খুব একটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা অভিসন্ধির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু বলল না মোহর। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আগে হেমনলিনীর সঙ্গে দেখাটা হোক, তারপর কৌশলে এই সময়ের কথা জেনে নেবে।

মোহর বলল, 'ঠিক আছে। আপনি যা বললেন তাই হবে।'

আগরওয়াল বলল, 'কাইগুলি আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে যখন ফিরে এল, তার সঙ্গে একজন মাঝবয়সী মহিলা। চেহারাটা মোটার দিকে হলেও বেশ সুন্দরী, ফর্সা। অবাঙালিদের অনেকেরই প্রচুর গয়না টয়না পরার ঝোঁক থাকে। এঁর তা নেই। হীরের আংটি, হীরের নাকছাবি, বড় লকেটওলা হার এবং কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। মাত্র এটুকুই। তার সাজপোশাকে সুরুচির ছাপ রয়েছে।

আগরওয়াল মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রী প্রভা।'

মোহর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার।'

প্রভা আগরওয়ালও হাতজোড় করে পরিষ্কার বাংলায় প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল, 'বসুন মিস দাশগুপ্ত।'

কথা বলতে বলতে মোহর লক্ষ করল, প্রভা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মহিলার চোখদুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদীই বলা যায়। যার দিকে তাকায় তার বুকের গভীর পর্যন্ত দেখতে পায়। মোহর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

প্রভা বলল, 'আপনিই ক'দিন ধরে এ বাড়িতে আসছিলেন?'

মোহর বলল, 'হ্যাঁ।' বার বার তার আসার কারণটাও জানালো।

প্রভা বলল, 'আমি জানি। আগরওয়াল সাহেব আমাকে বলেছেন।'

সৌজন্যমূলক দু-চার কথার পর মোহর আগরওয়ালকে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আগরওয়াল উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী অনুরোধ?'

মোহর বলল, 'হেমনলিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করার আগে আমি 'শান্তি ভবন'টা একটু ঘুরে দেখতে চাই। মানে, আমাদের ডকু-ফিচারের জন্যে বাড়িটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেব কাজে লাগাতে হবে তো।'

একটু চুপ করে থেকে আগরওয়াল বলল, 'ঠিক আছে।'

মোহর বলল, 'আর বসে থেকে কী হবে? আপনার অসুবিধা না হলে এবার কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

আগরওয়াল মোহরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রভাও তাদের সঙ্গ নিল। মোহরের কেমন একটা খটকা লাগল, মহিলা কি সন্দিগ্ধমনা? সন্দেহের কারণে স্বামীকে কি একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে একা ছাড়তে চাইছে না? পরক্ষণে মনে হল, তাই বা হবে কেন? পরশু সে যে এ বাড়িতে এসেছিল; প্রভা তা জানে। নজরদারি করার ইচ্ছা হলে তখনই তো ড্রইং রুমে এসে ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে পারত। তা হলে এখন তাদের সঙ্গ নেবার উদ্দেশটা কী? তা ছাড়া আরও একটা ব্যপার মোহর বুঝে উঠতে পারছে না; প্রবীণ আগরওয়াল ঘটা করে তার সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয়ই বা করিয়ে দিল কেন? সব মিলিয়ে মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

আগরওয়ালরা একতলায় যে অংশটায় থাকে সেটা সারিয়ে টারিয়ে, রং করে, সাজিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অন্য অংশটা 'শান্তি ভবন'-এর বাইরের দিকের মতোই ভাঙাচোরা। এখানে রয়েছে বিশাল হল ঘিরে অনেকগুলো ঘর। হল এবং ঘরের ফাটল-ধরা মেঝের ওপর দু-ইঞ্চি পুরু ধুলোবালি আবর্জনা জমে আছে। বহুকাল এগুলো সাফ করা হয় না। দেওয়াল এবং উঁচু সিলিং থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। এত ধ্বংসের মধ্যেও কত মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য জিনিস যে চারিদিকে ছড়ানো তার হিসেব নেই। হলের যে বিশাল ঝাড়বাতিটা রয়েছে, আগে আর এমনটা কখনও দেখেনি মোহর। তা ছাড়া মেহগনি কাঠের সোফা সেট, টেবল চেয়ার, খাট আলমারি এবং অন্য সব ক্যাবিনেট ধুলোয় ঢেকে গেলেও সেগুলোর কারুকাজ মুগ্ধ করে দেয়। হল-ঘরের ডান পাশের প্রকাণ্ড একটা কামরায় এসে দেখা গেল, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের বাদ্যযন্ত্র গাদা করে ফেলে রাখা হয়েছে।

তানপুরা, এস্রাজ, ডুগি-তবলা ছাড়া বাকিগুলোর নামও জানে না মোহর। তবে ওগুলো যে খুবই দুর্লভ সেটা আন্দাজ করা যায়।

দোতলার হল-ঘরটা একতলার মতোই। তেমনই পুরনো ধাঁচের আসবাবে বোঝাই। এখানে অবশ্য বাজনার জিনিস টিনিস নেই। এখানকার দেওয়ালে নাম-করা শিল্পীদের অয়েল পেন্টিং ছাড়াও একধারে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে নানা ধরনের স্কেচ আর জলরঙে আঁকা অজস্র ছবি। গানবাজনা বা পেন্টিং টেন্টিং খুব ভাল বোঝে না মোহর। তবে 'শান্তি ভবন'-এর এই সব স্কেচ আর ছবি যে কপি নয়, সবই অরিজিনাল সেটা তার অনভিজ্ঞ চোখও ধরে ফেলে। সে শুনেছে, পুরনো আর্ট অবজেক্টের সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচুর কদর। রবি বর্মা, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন মজুমদার থেকে নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিখ্যাত শিল্পীদের এই সব ছবির দাম কম করে কোটি টাকার ওপর। এই অমূল্য সম্পত্তি এত অযত্নে কেন ফেলে রাখা হয়েছে আগরওয়ালকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল মোহর। খুব সম্ভব লোকটা ছবিগুলোর মর্ম বোঝে না। বাজারে এগুলোর কী ধরনের চাহিদা সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাও হয়তো ওর নেই। আগরওয়ালের যদি বদ মতলব থাকে ছবিগুলোর দাম জানতে পারলে বেচেও দিতে পারে। ওকে একটু বাজিয়ে দেখার জন্য মোহর জিজ্ঞেস করল, 'সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।'

আগরওয়াল বলল, 'থাক পড়ে। এ সব দিয়ে আর কী হবে?'

এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করল না মোহর। বেশি আগ্রহ দেখালে লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে।

দোতলার আরেক ধারে দুটো বড় বড় ঘর জুড়ে মল্লিক বংশের বিশাল লাইব্রেরি। বাংলা, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় লেখা অসংখ্য বই এখানে দেখা গেল। প্রতিটি বইয়ের গায়ে সোনার জলে নাম লেখা। অয়েলপেন্টিং এবং স্কেচগুলোর মতো এগুলোর একই অবস্থা। অযত্নে আর অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। কোনও কোনওটায় উই ধরে গেছে।

লাইব্রেরির একটা ঘরের আধভাঙা জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়। সেদিকে তাকাতেই মোহরের চোখে পড়ল, তেতলা থেকে দোতলার এই অংশ পর্যন্ত অনেকটা জায়গা ভাঙা।

লাইব্রেরি ট্রাইবেরি দেখা হলে আগরওয়াল আর প্রভা তেতলায় নিয়ে এল মোহরকে। নিচের দুটো তলার সঙ্গে এটার আদৌ তফাত নেই। হল-ঘর বেডরুম ইত্যাদি মিলিয়ে নকশা একই রকম। আসবাব টাসবাব তেমনই সেকেলে, ভারী

ভারী, কারুকার্যময়।

আগরওয়াল বলল, 'এদিকে আসুন।'

হল-ঘর পেরিয়ে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায় চলে আসে মোহররা। প্রকাণ্ড খাটের মাঝখানে অত্যন্ত রুগ্ন চেহারার একটি বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন। স্বাস্থ্য বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চামড়া কুঁচকে ঢিলে হয়ে গেছে। বেশির ভাগ দাঁত নেই, ফলে গাল ভেঙে ভেতরে ঢোকানো। চুল ধবধবে সাদা, চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ। একসময় যে অসাধারণ সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়।

শিয়রের কাছে একটা টেবলে প্রচুর ওষুধপত্র সাজানো রয়েছে। একজন মধ্যবয়সী নার্স ইঞ্জেকশান দেবার জন্য সিরিঞ্জে ওষুধ ভরছিল।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে মোহররা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আগরওয়াল সসম্ভ্রমে নিচু গলায় ডাকল, 'মা—'

হেমনলিনী খুব ধীরে ধীরে এধারে মুখ ফেরালেন।

আগরওয়াল বলল, 'আপনাকে যাঁর কথা বলেছিলাম তিনি এসে গেছেন।'

একটা হাত তুলে ইঙ্গিতে আগরওয়ালদের বসতে বললেন হেমনলিনী।

নার্স বলল, 'আমি ইঞ্জেকশানটা দিয়ে নিই। তারপর কথা বলবেন।'

খাট থেকে খানিকটা দূরে কয়েকটা গদি-মোড়া চেয়ার রয়েছে। খুব সম্ভব হেমনলিনীর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তারা ওগুলোতে বসে। আগরওয়াল চেয়ারের সারি দেখিয়ে খুব আস্তে মোহরকে বলল, 'বসুন।'

মোহর যেখানেই যায় তার সেই ঢাউস ব্যাগটা সঙ্গে থাকে। সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। আগরওয়াল আর প্রভা কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। সিরিঞ্জে ওষুধ ভরা হয়ে গিয়েছিল। নার্স হেমনলিনীর ডান হাতে ইঞ্জেকশানটা দেবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে রইলেন। ওষুধটা বোধ হয় খুবই যন্ত্রণাদায়ক। ওঁর মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

মিনিট দশেক পর সামলে উঠে আস্তে আস্তে চোখ মেলে মোহরকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন হেমনলিনী। চেয়ার থেকে উঠে সে কাছে যেতে খাটের একটা ধার দেখিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'এখানে বসো।'

কথামতো বসল মোহর। প্রবীণ আগেই খাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে লক্ষ করল, প্রভাও অনেকখানি এগিয়ে এসেছে।

হেমনলিনী এবার মোহরের নাম, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছে

ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। সে যখন বলল, ইংরেজি নিয়ে এম. এ পাশ করেছে, খুব খুশি হলেন। বললেন, 'আমিও এম. এ পাশ করেছিলাম চুয়ান্ন বছর আগে ; সেই নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে। ফিলজফি নিয়ে। তখন কলকাতায় যুদ্ধ চলছে। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে খুব অল্প ক'টি মেয়ে পড়ত।' একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'আজকাল শুনি অনেক মেয়ে এম. এ পড়ে।'

'হ্যাঁ, প্রচুর। ছেলে আর মেয়ে প্রায় সমান সমান।'

'খুব ভাল। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হওয়াটা দরকার।'

মোহর উত্তর দিল না। কাজের কথাটা কীভাবে শুরু করবে সেটা মনে মনে গুছিয়ে নিতে লাগল।

হেমনলিনী এবার বললেন, 'প্রবীণ বলছিল তুমি নাকি আমাকে নিয়ে সিনেমা করতে চাও? অসুস্থ বুড়ো মানুষকে পর্দায় কে দেখতে চাইবে? একেবারে পাগলামি।'

মোহর জানালো, সিনেমা নয়, ডকু-ফিচার করতে চায়। এবং সেটা কী, বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল।

হেমনলিনীর জ্যোতিহীন চোখে আলোর ঝলক খেলে গেল যেন। কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বললেন, 'মল্লিকরা খুবই নাম-করা বংশ। বাঙালির জীবনে তাদের কত কনস্ট্রিবিউশন। কিন্তু সবাই মল্লিকদের ভুলে গেছে। বাঙালিরা গৌরবময় অতীতের কথা মনে রাখে না।'

মোহর হেসে হেসে বলল, 'যাতে রাখে সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি। ডকু-ফিচারটা করলে আপনাদের কথা এই জেনারেশনের মানুষ জানতে পারবে। তারা প্রেরণা পাবে।'

হেমনলিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার খবর তোমায় কে দিল?'

'আমার বন্ধু যে এই ডকু-ফিচারটার ডাইরেকশান দেবে তার কাছে শুনেছি।'

'যাক, আমাদের এই বংশ সম্পর্কে তোমাদের যে আগ্রহ আছে, শুনে বড় ভাল লাগল।'

মোহর বলল, 'মিস্টার আগরওয়ালের মুখে শুনেছি, আপনি অনেকদিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। অসুখটা কী?'

হেমনলিনী বললেন, 'সে কি এক-আধটা? কিডনি খারাপ, হার্টে গোলমাল, ব্লাড সুগার—রোগ নেই, শরীরের এমন একটা জায়গা খুঁজে পাবে না। আসলে এই হল বার্ধক্য।' ইংরেজি করে বললেন, 'ওল্ড এজ হ্যাজার্ডস। কিছুই করার

নেই। ওষুধ ইঞ্জেকশানের ওপর কোনও রকমে টিকে থাকা।'

মোহর সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে একা দেখছি। আপনাদের বংশের আর কেউ জীবিত নেই?' কথাটা শেষ হতে না হতেই সে টের পেল প্রভার একটা হাত তার বাঁ কাঁধে জোরে চাপ দিল। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। নিষেধাজ্ঞাটা মনে করিয়ে দিয়েছে সে। এ জাতীয় প্রশ্ন করা চলবে না।

প্রভা কেন তার সঙ্গে ওপরে উঠে এসেছে, এবার টের পাওয়া যাচ্ছে। হেমনলিনীকে কোন প্রশ্নটা করা চলবে না, পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সেটা বুঝিয়ে দেবে সে। চোখের কোণ দিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে ফের হেমনলিনীর দিকে তাকাল মোহর। বৃদ্ধার কোঁচকানো মুখের চামড়ায় চকিতের জন্য ভয়ের একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল কী?

হেমনলিনী ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'কী জানি, কেউ বেঁচে আছে কিনা বলতে পারব না। বয়েস হয়েছে, আজকাল কিছু মনে থাকে না।'

খানিক আগের উৎসাহ আর আনন্দের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না হেমনলিনী মধ্যে। কেমন যেন অবসন্ন, বিষাদগ্রস্ত। অথৈ নৈরাশ্যের ভেতর তিনি যেন তলিয়ে যাচ্ছেন।

মোহর ধন্দে পড়ে গেল। হেমনলিনী কি সঠিক উত্তর দিলেন? যিনি তেতাল্লিশ সালে যুদ্ধকালীন কলকাতার কথা নির্ভুল বলে গেছেন, মল্লিকদের অন্য কোনও বংশধর জীবিত আছে কিনা সেটাই শুধু তাঁর মনে নেই!

হেমনলিনী নির্জীব গলায় হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার আপনজন বলতে এই প্রবীণ—সেই আমার ছেলে। আর ওই প্রভা হল বৌমা। ওরা আমার জন্যে যা করছে, বলে বোঝাতে পারব না। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নার্স রেখে দিয়েছে। ওষুধপত্র, সেবাযত্ন, কোনও কিছুর ত্রুটি নেই।'

কথাগুলো কতটা আন্তরিক সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায় মোহরের। মুখস্থ বলার মতো আবেগহীন সুরে যেন আউড়ে গেলেন হেমনলিনী।

একটু ভেবে মোহর বলল, 'এখনকার কথা থাক। আপনার কাছে মল্লিক বংশের পুরনো দিনের ইতিহাস শুনতে চাই—'

হেমনলিনীর চোখেমুখে ফের সজীবতা ফিরে এল যেন। উৎসাহের সুরে বললেন, 'ঠিক আছে, শোন—'

মোহর টের পেল তার কাঁধ থেকে প্রভার হাতটা সরে গেছে। সে হেমনলিনীকে বলল, 'আমি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসি। শুনলে পরে হয়তো

সবটা মনে থাকবে না। তাই রেকর্ড করে রাখতে চাই।'

'আচ্ছা—'

ঢাউস ব্যাগ থেকে জাপানি টেপ-রেকর্ডার বার করে হেমনলিনীর সামনে রেখে সুইচ টিপে চালিয়ে দিল মোহর। ওটা ব্যাটারিতে চলে। বলল, 'শুরু করুন—'

হেমনলিনী আরম্ভটা করলেন এভাবে। একশ পঁচিশ তিরিশ বছর আগে বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে এই বংশের একজন প্রথম কলকাতায় আসেন। তখন ইংরেজ রাজত্ব। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই গ্রাম্য যুবকটি কীভাবে অদম্য মনের জোরে লেখাপড়া শিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যেতে থাকেন।

মোহর লক্ষ করল, কথা বলতে বলতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে হেমনলিনীর। টেপ বন্ধ করে সে বলল, 'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল এলে অসুবিধা হবে না তো?'

হেমনলিনী আগরওয়ালের দিকে তাকালেন। অর্থাৎ সুবিধা বা অসুবিধাটা যেন তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

আগরওয়াল মোহরকে বলল, 'না, কোনও প্রবলেম নেই। আপনি আসতে পারেন।'

মোহর কিন্তু তার কথার উত্তর না দিয়ে হেমনলিনীকে বলল, 'কাল এসে আবার খানিকটা শুনব।' চেয়ার থেকে উঠে টেপ-রেকর্ডারটা ব্যাগে ভরে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে যদি ঠাকুমা বলি, আপত্তি নেই তো?'

স্নিগ্ধ হেসে হেমনলিনী বললেন, 'কীসের আপত্তি? আমি খুব খুশি হব। আমার নাতনি থাকলে তোমার বয়সীই হতো।'

ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়েছিল মোহর। বলল, 'আজ তা হলে চলি—'

'এসো—'

দরজার কাছে গিয়ে কী ভেবে একবার পেছন ফিরে তাকাল মোহর। হেমনলিনী বালিশ থেকে মাথা তুলে ব্যাকুলভাবে তাকে দেখছেন। মনে হল, মল্লিক বংশের ইতিহাস ছাড়াও অনেক কিছুই যেন তাঁর বলার ছিল কিন্তু বলতে পারেননি।

মোহর সামনের দিকে তাকিয়ে ফের চলতে শুরু করল। প্রভা হেমনলিনীর ঘরেই থেকে গেছে, তবে আগরওয়াল তার সঙ্গে চলে এসেছে। হঠাৎ কী মনে পড়তে মোহর বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, আপনাকে আজ আরেকটু কষ্ট

দেবো—'

মোহর মোটামুটি তার নিষেধাজ্ঞা মেনে চলেছে ; সে জন্য আগরওয়াল সন্তুষ্ট। অন্তত লোকটার মুখচোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। বলল, 'বলুন কী করতে হবে—'

'এ বাড়ির ছাদটা একবার দেখতে চাই। যদি দেখিয়ে দেন—'

'ছাদ দেখে কী হবে? ট্যাঙ্ক আর বাতিল জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কিছুই ওখানে নেই।'

• মোহর বুঝিয়ে বলল, 'এই বাড়িটাকে ঘিরে যখন ডকু-ফিচারটা করা হবে তখন চারপাশের পরিবেশও তো দেখানো চাই। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

আগরওয়াল হয়তো বুঝল, ছাদে যেতে চাওয়ার মধ্যে মোহরের কোনও দুরভিসন্ধি নেই। বলল, 'চলুন তা হলে—'

ছাদে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল মোহর। সামনের দিকে রাস্তার ওপারে লাইন দিয়ে পুরনো ধাঁচের একতলা দোতলা বা তেতলা বাড়ি। ডান পাশে এবং বাঁ পাশেও তাই। কয়েকটা ঝকঝকে নতুন হাই-রাইজ যেমন হয়েছে তেমনি আছে ঘিঞ্জি কিছু বস্তিও।

মোহর লক্ষ করল, 'শান্তি ভবন'-এর কমপাউন্ড প্রায় এক বিঘের মতো। এতটা জমির মাঝখানে এমন বড় বাড়ি এদিকে আর একটাও নেই।

তিন পাশ দেখা হলে পেছন দিকটায় এল মোহর। আসলে এধারে আসাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। এখানে দেখা গেল ছাদের একটা অংশসুদ্ধ তেতলা এবং দোতলার অনেকটা জায়গা ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এটাই তার চোখে পড়েছিল।

মোহর বলল, 'এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।'

আগরওয়াল বলল, 'অনেক দিনের পুরনো বাড়ি তো। স্ট্রাকচারের জোর কমে গেছে। গেল বছর প্রচণ্ড বর্ষা হল না? তাতেই ভেঙে পড়েছে।'

মোহরের কিন্তু পরিষ্কার মনে হচ্ছে, দেওয়াল থেকে চুনবালি খসে গেলেও কিংবা মেঝেতে ফাটল ধরলেও, 'শান্তি ভবন' এখনও যথেষ্ট মজবুত। বর্ষায় এভাবে ভেঙে পড়তে পারে না। তার ধারণা, ভাঙা হয়েছে। সে বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, এ দিকটার যা হাল, গোটা বাড়িটাই হুড়মুড় করে একদিন ধসে পড়বে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল আগরওয়াল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'মিস্তিরি লাগিয়ে ইমিডিয়েটলি সারিয়ে নেওয়া দরকার।'

'মাকে বলেছি, উনি ভাবছেন। যতক্ষণ না গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছেন আমার তো কিছু করার নেই।'

'এতে ভাবাভাবির কী আছে?'

আগরওয়াল বলল, 'প্রথমত অনেক টাকা খরচ হবে। তা ছাড়া সারিয়ে নিলেও এই পুরনো বাড়ি কতদিন টিকবে কে জানে। তখন টাকাটাই পুরো বরবাদ।'

মোহর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলল, 'দেখা হয়ে গেছে। চলুন, যাওয়া যাক—'

পাঁচ

'শান্তি ভবন' থেকে বেরিয়ে হঠাৎ মোহরের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল। হেমনলিনীর কাছ থেকে মল্লিক বংশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু এখনকার কথা কিছুই জানা যাবে না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রভা আর প্রবীণ আগরওয়াল সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেবে। হেমনলিনীও উত্তর দেবেন না। 'মনে নেই' বলে বা অন্য কোনও অজুহাতে এড়িয়ে যাবেন। মোহরের ধারণা, তিনি আগরওয়ালদের ভয় পান। ওরা কি এই অভিজাত বংশের শয্যাশায়ী বৃদ্ধাকে বন্দী করে রেখেছে?

আগরওয়াল বা হেমনলিনীর কাছে মল্লিক বংশের একাল সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়ার আশা নেই; কিন্তু 'শান্তি ভবন'-এর চারপাশে পুরনো যে বাসিন্দারা রয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করলে কিছু কি পাওয়া যাবে না? চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

বাঁ দিকে পর পর সাতটা বাড়িতে হানা দিয়েও কাজের কাজ কিছুই হল না। প্রতিটি বাড়ির লোকজন জানিয়ে দিল, তারা পাশাপাশি থাকে, এই পর্যন্ত। 'শান্তি ভবন'-এ একটি বৃদ্ধা আর একটা অবাঙালি ফ্যামিলি থাকে; এর বেশি আর কোনও খবর তারা দিতে পারল না। আসলে মানুষ আজকাল বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। এই কঠিন সময়ে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য উদয়াস্ত তাদের এত পরিশ্রম আর ছোটাছুটি করতে হয় যে অন্যের খোঁজ নেওয়ার মতো উৎসাহ থাকে না।

মোহর কিন্তু আশা ছাড়ল না ; নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইল এবং তার ফলও পাওয়া গেল। আট নম্বর বাড়িটায় কড়া নাড়তে যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। কিন্তু এখনও তাঁর শিরদাঁড়া টান টান। চেহারা

রোগা ধরনের হলেও বয়স তাঁকে বিশেষ কাবু করে ফেলতে পারেনি।

মোহর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। দয়া করে আধ ঘণ্টার মতো সময় দিতে হবে।'

বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'আধ ঘণ্টা কেন, সারাদিন তুমি কথা বল না। আমার অখণ্ড অবসর। এসো—'

ভেতরের একটা বৈঠকখানায় মোহরকে এনে বৃদ্ধ বললেন, 'বসো। তোমার পরিচয় পেয়েছি। এবার আমারটা শোন।'

বৃদ্ধের নাম অবিনাশ হালদার। সরকারি চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর বাইশ বছর পেনসন ভোগ করছেন। তিনি নিঃসন্তান, স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

সামান্য আলাপেই বোঝা গেল, অবিনাশের মধ্যে একটা আপন-করা ব্যাপার আছে। মানুষটি ভারি অমায়িক। বললেন, 'আগেই বলে রাখছি, চা কিন্তু খাওয়াতে পারব না। আমার স্ত্রী ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে।'

মোহর ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না না, চায়ের দরকার নেই।'

অবিনাশ বললেন, 'তা হলে শুরু করা যাক। তুমি যে জন্যে এসেছ, বল—'

মোহর তার আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিল।

অবিনাশ সব শুনে বললেন, 'আমার জন্মকর্ম সব এ পাড়ায়। একসময় মল্লিকদের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিখ্যাত বংশ। বাঙালির জীবনে ওদের কত অবদান। ভারতবর্ষের কত বড় বড় মানুষকে এখানে আসতে দেখেছি। অত বিরাট বংশ চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। হেমনলিনী মল্লিক ছাড়া আর কেউ এখন 'শান্তি ভবন'-এ থাকে না। শুনেছি ওর এক দেওরের ছেলে আছে আমেরিকায়। অনেক বছর কলকাতায় আসেনি। বাড়ির সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে চায় না।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'প্রবীণ আগরওয়াল বলে একটা লোক তার ফ্যামিলি নিয়ে ওখানে থাকে।'

'হ্যাঁ, জানি। বছর ছয় সাতেক ওরা ওখানে আছে। আগে মাঝে মাঝে হেমনলিনী বৌদিকে দেখতে যেতাম কিন্তু আগরওয়াল এসে উঁচু লোহার গেট বসালো, দারোয়ান রাখল। কাউকে ওরা ভেতরে ঢুকতে দেয় না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফের অবিনাশ বললেন, 'আমার গায়ে-পড়া নাক-গলানো স্বভাব নয়। ওরা যখন চায় না তখন আমিও যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

মোহর জিজ্ঞেস করল, 'আগরওয়াল লোকটাকে আপনার কিরকম মনে হয়?'

'ওকে দেখেছি মাত্র। মেলামেশার সুযোগ হয়নি। কী করে বলি লোকটা কেমন। তবে—'

'কী?'

'আমার সন্দেহ, আগরওয়ালের 'শান্তি ভবন'-এর ব্যাপারে কিছু একটা মতলব আছে।'

'এরকম সন্দেহের কারণ?'

'লোকটা যদি পরিষ্কার হত, সারাক্ষণ গেট বন্ধ করে রাখত না। গোপনে কিছু একটা করছে মনে হয়।'

মোহর উত্তর দিল না।

অবিনাশ এবার বললেন, 'তুমি তো বাড়ির ভেতর গিয়েছিলে। হেমনলিনী দেবী আর আগরওয়ালের সঙ্গে কথাও বলেছ। তোমার কী ধারণা হল?'

মোহর বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে আগরওয়ালের অভিসন্ধিটা যে কী, সেটা ধরতে পারিনি।'

'তুমি তো এখন রেগুলারলি ও বাড়িতে যাবে। ভাল করে লক্ষ করো। তোমার মতো শিক্ষিত, ইনটেলিজেন্ট মেয়ে ঠিক ধরে ফেলতে পারবে।'

'দেখা যাক। হেমনলিনী দেবীর দেওরের যে ছেলে আমেরিকায় থাকেন তাঁর ঠিকানা জানেন?'

'না। আমেরিকায় থাকে শুনেছিলাম। অস্ট্রেলিয়া কি কানাডাও হতে পারে। মোট কথা বিদেশে থাকে।'

একটু ভেবে মোহর জিজ্ঞেস করল, 'একটা ব্যাপার কি আপনার চোখে পড়েছে?'

অবিনাশ বললেন, 'কী বল তো?'

মোহর বলল, 'মল্লিকবাড়ির পেছন দিকের অনেকটা অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। আগরওয়ালকে জিজ্ঞেস করতে বলল, লাস্ট ইয়ারের বর্ষায় নাকি ধসে পড়েছে।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। 'শান্তি ভবন' অনেক আগে তৈরি হলেও ওটা এত শক্তপোক্ত যে গেল বছরের বর্ষায় ধসে পড়লে এ পাড়ার পুরনো বাড়িগুলো একটাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। আমি নিজে দেখছি, লাস্ট ইয়ারের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে ক'টা লোক 'শান্তি ভবন'-এর পেছন দিকটা

ভাঙছে। তোমাকে বলেছি আমি কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। কিন্তু তখন আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। রাস্তায় তক্কে তক্কে রইলাম। লোকগুলো বেরুলে জিজ্ঞেস করলাম, ভাঙা হচ্ছে কেন? ওরা বলল, বাড়ির ওদিকটায় নাকি ফাটল ধরেছে। তাই ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হবে। তারপর অবশ্য—'

'কী?'

'ওটা ওইভাবেই পড়ে আছে। সারানো হয়নি।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে পড়ল মোহর, 'আজ যাই। আপনাকে খুব বিরক্ত করে গেলাম। দরকার হলে আবার কিন্তু আসব।'

অবিনাশ বললেন, 'যখন ইচ্ছে এসো।'

ছয়

পরদিন থেকে রোজ আসতে লাগল মোহর। খাটে হেমনলিনীর পাশে বসে মল্লিক বংশের গৌরবময় ইতিহাস অল্প অল্প করে রেকর্ড করতে লাগল। যতক্ষণ সে এ ঘরে থাকে, প্রবীণ আগরওয়াল এবং প্রভা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নজরদারি চালিয়ে যায়।

পুরনো দিনের কথাই শুধু জানতে চাইছে মোহর। তাই আগরওয়ালরা কোনওরকম আপত্তি করছে না, বাধাও দিচ্ছে না।

সপ্তাহখানেক এভাবে কাটার পর প্রভারা হেমনলিনীর ঘরে থাকলেও তেমন লক্ষ রাখছিল না। হয়তো ভেবেছিল তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে যখন পালন করা হচ্ছে তখন আর বেশি কড়াকড়ির দরকার নেই।

হেমনলিনী এই বয়সেও, স্বাস্থ্য যখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, কতটা প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী সেটা টের পাওয়া গেল। একদিন প্রভারা যখন একটু অন্যমনস্ক আর মোহর টেপ করে চলেছে, নিঃশব্দে তাঁর ক্ষীণ একটি হাত ওর মুঠোর ভেতর সরু করে ভাঁজ-করা কী একটা কাগজ ঢুকিয়ে দিল। মোহর বুঝতে পারল, কাগজটায় অত্যন্ত গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। তার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন। আগরওয়ালরা যাতে টের না পায়, এমনভাবে কাগজটা এক ফাঁকে রুমাল বার করার অছিলায় জিনসের পকেটে পুরে ফেলল।

রোজ হেমনলিনীর ঘরে আধ ঘণ্টার মতো থাকে মোহর। আজ মিনিট পনেরোর মধ্যেই টেপ-রেকর্ডার ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে পড়ল। কাগজটায় কী আছে তা দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজনা চলছিল তার।

রোজই 'শান্তি ভবন' থেকে বেরুবার সময় আগরওয়াল নিচের তলা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসে। আজও পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বলে উঠল, 'মিস দাশগুপ্ত, আজ আপনাকে কেমন যেন টেনস দেখাচ্ছে। কোনও কারণে আর ইউ ডিসটার্বড?'

আগরওয়াল কখনও মোহর সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে না। অত্যন্ত নির্লিপ্ত মুখে তাকে নিচে পৌঁছে দিয়ে যায়। সেও যতটা সম্ভব নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করে। তবে কি আজ তার ভেতরকার তুমুল আলোড়ন মুখেচোখে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে আগরওয়ালেরও নজরে পড়ে গেছে? মোহর সামান্য হকচকিয়ে যায়। দ্রুত সামলে নিয়ে বলে, 'আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?'

একটু হেসে আস্তে মাথা নাড়ল আগরওয়াল, 'হ্যাঁ।'

মোহর কিছু বলে না।

আগরওয়াল এবার বলল, 'অন্য দিন আপনি মিনিমাম আধ ঘণ্টা মায়ের কথা টেপ করেন। আজ ওনলি ফিফটিন মিনিটস।'

মোহর বলল, 'আমার একটা আর্জেন্ট কাজ আছে। তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'ও।'

বাড়ির বাইরে এসে ডানদিকে হাঁটলে বড় রাস্তা। এখন দশটার মতো বাজে। ট্রাম, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। চারিদিকে থিকথিকে ভিড়।

রাস্তা পেরিয়ে ওধারের একটা পার্কে চলে এল মোহর। এখানে লোকজন বিশেষ নেই। এক কোণে ফাঁকা একটা বেঞ্চে বসে পকেট থেকে হেমনলিনীর সেই কাগজটা বার করল সে। ভাঁজ খুলতে দেখা গেল মাত্র কয়েক লাইনের একটা চিঠি। কাঁপা কাঁপা হাতে খুব দ্রুত যে লেখা হয়েছে, হরফগুলো দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল।

'কল্যাণীয়া মোহর, আগরওয়ালরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। এমনিতেই আমি শয্যাশায়ী, বয়স উনআশি চলছে। শারীরিক শক্তি অনেকদিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে। বাইরের কারও সঙ্গে যে যোগাযোগ করব তার উপায় নেই। আমার ঘরে একটা টেলিফোন ছিল, প্রবীণরা সেটা কেটে দিয়েছে। ওরা সবসময় আমার ওপর নজর রাখে। এমনকি যে নার্সটিকে দেখলে, আমার পুরনো নার্সকে বদলে ওকে রাখা হয়েছে, আমার ওপর পাহারাদারি করার জন্য। তুমি অবিলম্বে জয়দেবের সঙ্গে দেখা করবে। নিচে তার ঠিকানা দিলাম।

'মাত্র কয়েকদিন তোমাকে দেখছি। মনে হয়েছে তুমি খুবই সাহসী এবং বুদ্ধিমতী। জয়দেবের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবে আমি কী ধরনের বিপদের মধ্যে আছি। হঠাৎ আমার মৃত্যু ঘটলে মল্লিক বংশের ইতিহাস হয়তো চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

'জবা, মানে নার্সটি বাথরুমে ঢুকেছে। সেই ফাঁকে ওর একটা ডট পেন আর কাগজ জোগাড় করে এই চিঠি লিখছি। বেশি লেখার সময় নেই। যে কোনও মুহূর্তে জবা বেরিয়ে আসতে পারে। তখন আমার কী অবস্থা হবে, বুঝতেই পারছ।

'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। আমাকে মুক্ত করে মল্লিক বংশের অতীত গৌরবকে একালের মানুষের কাছে তুমিই তুলে ধরতে পারবে। সেই সঙ্গে 'শান্তি ভবন'-কে বাঁচানোর দায়িত্বও তোমাকে দিচ্ছি।'

আশীর্বাদিকা

হেমনলিনী মল্লিক

চিঠির তলায় এক কোণে লেখা আছে ঃ শ্রী জয়দেব চৌধুরী। ১২ নং হরগোপাল সিংহ লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা।

পড়ার পর শ্বাসরুদ্ধের মতো অনেকক্ষণ বসে রইল মোহর। গোড়া থেকে সে যা সন্দেহ করছিল তা-ই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 'শান্তি ভবন'- কে গ্রাস করতে চাইছে আগরওয়ালরা। এতদিন ওদের ঠেকানোর কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না হেমনলিনী। তাকে পেয়ে যেন বেঁচে গেছেন।

কিন্তু একটা ব্যাপার মোহরের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। আগরওয়ালরা কীভাবে 'শান্তি ভবন'-এ ঢুকল এবং কীভাবেই বা রুগ্ন, অসুস্থ হেমনলিনীকে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল?

হেমনলিনী অবশ্য লিখেছেন, জয়দেব চৌধুরীর কাছ থেকেই সব জানা যাবে। মোহর ঠিক করে ফেলল, এখনই জয়দেবের সঙ্গে দেখা করবে। 'শান্তি ভবন'-এ ডকু-ফিচারের তথ্য জোগাড় করতে এসে সে যেন ক্রমশ চমকপ্রদ এক রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে।

শ্যামবাজারে এসে ১২ নং হরগোপাল সিংহ লেনের শ্যাওলা-ধরা, স্যাঁতসেঁতে একতলা বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব একটা অসুবিধা হল না মোহরের। জয়দেব চৌধুরীকেও বাড়িতেই পাওয়া গেল। বয়স সত্তরের ওপর। মাথার একটা চুলও আর কালো নেই ; বাতে বেজায় কাবু।

মোহর হেমনলিনীর কাছ থেকে আসছে শুনে জয়দেবের চোখ দুটো আগ্রহে

জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, 'বৌদিদি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আসুন আসুন—'

একটা নোনা-ধরা, মেঝেয় চটা-ওঠা ঘরে এনে মোহরকে বসিয়ে তিনি এবার দ্বিধান্বিতভাবে বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ও বাড়িতে তো কেউ ঢুকতে পারে না। আপনি ভেতরে গেলেন কী করে?'

মোহর সব জানালো।

জয়দেব বললেন, 'ভাগ্যিস বৌদিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। মনে হচ্ছে 'শান্তি ভবন' এবার বেঁচে যাবে।' হঠাৎ মোহরের একটা হাত দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, 'বৌদিদি আর বাড়িটাকে বাঁচান মা।'

মোহর একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জানতে চাইছি। মল্লিকবাড়ির সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

জয়দেব জানালেন, তিনি 'শান্তি ভবন'-এ চাকরি করতেন। বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে বাজার করা, ডাক্তারের কাছে ছোটা, বাড়ির ট্যাক্স, টেলিফোনের বিল দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজ তাঁকে করতে হত। পঞ্চাশ বছর আগে ও-বাড়িতে চাকরি করতে ঢুকেছিলেন ; সেই যেবার দেশ স্বাধীন হল। তখন ওখানে কত লোকজন! 'শান্তি ভবন' দিনরাত গমগম করত। তারপর অত বড় বংশটা মরে হেজে একেবারে শেষ হয়ে গেল। বেঁচে রইলেন শুধু হেমনলিনী আর তাঁর দূর সম্পর্কের এক দেওরের ছেলে দিবাকর। দিবাকরও এদেশে থাকলেন না। আমেরিকায় পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। সেখানেই বিয়ে করে থেকে গেলেন। বাড়িতে দু-তিনজন কাজের লোক ছাড়া একেবারে একা হয়ে পড়লেন হেমনলিনী। তার ওপর নানারকম রোগে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। জয়দেব যতদিন ওখানে ছিলেন প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করেছেন আর 'শান্তি ভবন'-কে আগলে আগলে রেখেছেন।

জয়দেব বলতে লাগলেন, 'তারপর ওই শনি যেদিন ঢুকল সেদিন থেকেই সর্বনাশের শুরু। আমরা পুরনো যে দু-তিনজন কাজের লোক ছিলাম সবাইকে এক এক করে তাড়িয়ে নিজের লোক নিয়ে এল। ও বাড়ির দরজা আমাদের কাছে বন্ধ হয়ে গেল।'

জয়দেব কাকে শনি বলছেন, বুঝতে পারছিল মোহর। একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'হেমনলিনী দেবীর দেওরের ছেলের ঠিকানা আপনার কাছে আছে?'

'আছে।'

'আপনি তাঁকে সব জানিয়ে চিঠি দেন নি?'

'চার, চারটে চিঠি দিয়েছি। একটার মোটে উত্তর পেয়েছি। দিবাকরবাবু লিখেছেন, 'শান্তি ভবন' সম্পর্কে তাঁর এতটুকু আগ্রহ নেই। তিনি আর দেশে ফিরবেন না। তবে বৌদিদি যদি আমেরিকায় তাঁর কাছে চলে যেতে রাজী থাকেন, লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।'

'হেমনলিনী দেবীকে এই চিঠির ব্যাপারটা জানিয়েছেন?'

'কী করে জানাবো? ও বাড়িতে ঢোকার উপায় নেই। দিবাকরবাবুর চিঠিটা একটা খামে পুরে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সে চিঠি যে বৌদিদি পান নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওই প্রবীণ হারামজাদা নির্ঘাত ছিঁড়ে ফেলেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মোহর বলল, 'দিবাকরবাবুর ঠিকানাটা আমাকে লিখে দিন।'

জয়দেব পাশের ঘর থেকে কাগজে ঠিকানা লিখে এনে মোহরকে দিলেন।

মোহর বলল, 'আজ চলি—'

জয়দেব তার সঙ্গে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত এলেন। হঠাৎ কী মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়িয়ে মোহর বলল, 'আসল ব্যাপারটাই জানা হয় নি।'

'কী বলুন তো?'

'আগরওয়ালরা ও বাড়িতে ঢুকল কী করে?'

'আমি থাকতে থাকতেই নিচের তলার একটা দিক ভাড়া নিয়েছিল।' জয়দেব বলতে লাগলেন, 'ফাঁকাই তো পড়ে থাকত। তাছাড়া বৌদিদির টাকাপয়সারও টানাটানি চলছিল। তাই ভাড়া দিয়েছিলেন।'

আগরওয়ালদের 'শান্তি ভবন'-এ ঘাঁটি গেড়ে থাকার রহস্যটা এতদিনে পরিষ্কার হল।

সাত

জয়দেব চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের দিকে যেতে যেতে মোহরের চোখে পড়ল, সূর্যটা সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে। সেই সকালে দু'খানা পরোটা, আলুর তরকারি আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছিল সে। এখন টের পেল, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার, অবিনাশ হালদার এবং জয়দেব চৌধুরীর কাছ থেকে 'শান্তি ভবন' সম্পর্কে যে সব খবর জানা গেছে সেগুলো নিয়ে সুদীপ্তর সঙ্গে আলাদাভাবে এখনই আলোচনা করা দরকার। ডকু-ফিচারের তথ্য জোগাড় করতে এসে

হেমনলিনী মল্লিক এবং কলকাতার এক ঐতিহাসিক প্রাচীন বাড়ির সঙ্গে সে জড়িয়ে গেছে। কেউ তার ওপর কোনও দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় নি, তবু তার মনে হচ্ছে, হেমনলিনীর জন্য তাকে কিছু একটা করতেই হবে।

এখন আর 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ যাবে না মোহর। ওখানে সারাক্ষণই লোকজনের ভিড়। অন্য কারও সামনে আলোচনাটা করতে চায় না সে। কোনও রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে বসে সুদীপ্তকে সব জানিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে।

রাস্তার একটা আই এস ডি/এস টি ডি বুথ থেকে 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ ফোন করে সুদীপ্তকে পেয়ে গেল মোহর। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

সুদীপ্ত বলল, 'একজন ক্যামেরা 'বুক' করতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। কেন, কী হয়েছে?'

'তোমার সঙ্গে আর্জেন্ট ডিসকাসন আছে। ক্যামেরার ব্যাপারে ভদ্রলোককে প্রদীপের কাছে পাঠিয়ে ইমিডিয়েটলি এসপ্ল্যানেডে পাতাল রেল স্টেশনের সামনে চলে এসো। মেট্রো সিনেমার অপোজিটে গাড়ি পার্ক করে আমার জন্যে ওয়েট করো।'

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?'

'শ্যামবাজারের একটা টেলিফোন বুথ থেকে।'

'তুমি না হেমনলিনী দেবীর কাছে গিয়েছিলে?'

'সব বলব। তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।' বলে লাইন কেটে দেয় মোহর।

শ্যামবাজারে টিউব ট্রেনের স্টেশনে গিয়ে টিকেট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ঢুকতেই একটা ট্রেন হুস করে বেরিয়ে গেল। পনেরো মিনিট বাদে পরের ট্রেনটা ধরে এসপ্ল্যানেডে এসে পাতাল থেকে ওপরে উঠে আসতেই মোহর দেখতে পেল কার পার্কিং জোনে তার গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদীপ্ত। কাছে গিয়ে সে বলল, 'খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আগে ভাল একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে চল।'

'ওকে—' মোহরকে গাড়িতে তুলে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় এসে দোতলায় কোণের দিকে বড় পিলারের পাশে টেবল পেয়ে গেল সুদীপ্ত। অন্য টেবলগুলো এখান থেকে খানিকটা দূরে। পিলারের আড়াল থাকায় জায়গাটা

বেশ একটু নিরালাও। গলা উঁচুতে না তুললে তাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না।

স্টুয়ার্ডকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে সুদীপ্ত বলল, 'এবার বল—'

আজ 'শান্তি ভবন'-এ যাবার পর থেকে জয়দেব চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব বলে গেল মোহর।

শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুদীপ্ত। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা ভীষণ সিরিয়াস। বোঝাই যাচ্ছে, আগরওয়াল বাড়িটা পুরোপুরি দখল করতে চাইছে। কিন্তু—'

মোহর বলল, 'কিন্তু কী?'

'আমরা একটা ডকু-ফিচার করতে চাই। বাড়িটা কার হাতে গেল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার? তুমি যত তাড়াতাড়ি পার, মেটিরিয়াল জোগাড় করে ফেল। ব্যস—'

'কী বলছ তুমি!'

'মানে—'

'শান্তি ভবন' ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার ন্যাশনাল হিস্ট্রি। ওখানে কত দামী দামী রেয়ার বই, আর্ট অবজেক্ট আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে তার হিসেব নেই। ও বাড়ি একটা মিউজিয়াম হওয়া উচিত। আর তুমি বলছ কিনা, 'শান্তি ভবন'-এর ফিউচার নিয়ে ভাবাভাবির দরকার নেই! স্ট্রেঞ্জ—'

বিব্রতভাবে সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কী করতে পারি তুমিই বল না?'

'বাড়িটাকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। উই শুড্ হ্যাভ সাম সোশাল কমিটমেন্ট।'

'বাট হাউ? কেমন করে বাঁচাবে?'

'সেই জন্যেই তো তোমাকে তাড়া দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুদীপ্তকে উসকে দেবার জন্যই হয়তো মোহর বলে, 'একটা ডাকু-ফিচার বানাবার চেয়েও ন্যাশনাল হিস্ট্রির একটা অংশকে রক্ষা করা অনেক বেশি ইমপর্টেন্ট।'

খাবার এসে গিয়েছিল। নিঃশব্দে দু'জন খাওয়া শুরু করল। সুদীপ্তর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, গভীরভাবে সে কিছু ভাবছে।

মোহর একসময় বলল, 'আগরওয়ালদের মতলব যাই থাক, হেমনলিনী মল্লিককে ওরা যে যথেষ্ট যত্ন করে, সম্মান দেয়, সেটা নিজের চোখে দেখেছি।

কিন্তু ওঁর যা বয়েস হয়েছে তাতে যে কোনও সময় ন্যাচারাল ডেথ হতে পারে কিংবা আগরওয়ালদের লোভটা হঠাৎ বেশি চাগিয়ে উঠলে সামান্য নেগলিজেন্সেও উনি মারা যেতে পারেন। হেমনলিনী দেবীর মৃত্যুর আগেই ওই বাড়িটাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুদীপ্ত। হঠাৎ বলল, 'এক কাজ কর—'

'কী?'

'হেমনলিনী দেবী যেভাবে কাগজে লিখে লুকিয়ে তোমাকে অনেক কথা জানিয়েছেন তেমনি তুমিও ওঁর হাতে চিরকুটে প্রশ্ন লিখে জানতে চাইবে ঠিক কীভাবে এবং কোন এগ্রিমেন্টের জোরে আগরওয়ালরা ও বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে। এগ্রিমেন্টে কী লেখা আছে, সব ডিটেলে আপাতত জেনে নাও। তারপর পরমেশদা আর একজন ল'ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে কী স্টেপ নেওয়া যায়, ঠিক করব।'

'আচ্ছা—'

'বাট বি ভেরি কেয়ারফুল। আগরওয়ালরা যেন কোনওভাবেই টের না পায়।'

পরদিন থেকেই হেমনলিনীর স্মৃতিচারণ টেপ করার ফাঁকে ফাঁকে আগরওয়ালদের নজরদারি এড়িয়ে ভাঁজ-করা কাগজের টুকরো তাঁর হাতে গুঁজে দিতে লাগল মোহর। একদিন বাদে চিরকুটে যা প্রশ্ন লিখে দিত তার উত্তর পেয়ে যেত সে।

হেমনলিনী জানিয়েছেন, এগ্রিমেন্টে একতলার চারখানা বেডরুম, একটা ড্রইং রুম, দুটো বাথরুম, কিচেন, একটা স্টোর—সব মিলিয়ে চোদ্দ শ' স্কোয়ার ফিটের মতো জায়গা পাঁচ বছরের জন্য আগরওয়ালদের লিজ দেওয়া হয়েছিল। পরিষ্কার লেখা ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের পর হয় নতুন চুক্তি করে লিজের মেয়াদ বাড়াতে হবে; নইলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হেমনলিনীর স্মৃতিশক্তি এই বয়সেও অনেকখানি প্রখর। কিন্তু দ্বিতীয় বার লিজের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য নতুন চুক্তি করা হয়েছিল কিনা সেটা তাঁর মনে নেই। কেননা, মাঝখানে একটা সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিডনি এবং হার্টের কী সব অসুখে বেশ কিছুদিন প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। চারপাশে যা ঘটছে কিংবা তাঁকে কে কী বলছে তার কিছুটা বুঝতেন, কিছুটা বুঝতেন না। সেই সময় আগরওয়ালরা তাঁকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়েছিল কিনা, তাঁর মনে নেই। তবে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও হেমনলিনী টের পেতেন মাঝে মধ্যেই বড় বড় ডাক্তার নিয়ে

আসত আগরওয়ালরা ; তাঁর সেবাযত্নের ত্রুটি হয়নি।

পরে আচ্ছন্নতা কেটে যাবার পর হেমনলিনী সুস্থ হলেন ঠিকই; তবে শরীর এতই ভেঙে পড়ল যে বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। শয্যাশায়ী হয়ে থাকতেন। এখনও তাই আছেন। বাকি জীবন এভাবেই কাটাতে হবে।

মোটামুটি কঠিন রোগের ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর হেমনলিনী লক্ষ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব পুরনো নার্সের বদলে এখনকার নার্সটিকে বহাল করা হয়েছে। ঘরের টেলিফোনটা নেই। বহুদিন ধরে যারা 'শান্তি ভবন'-এ কাজ করছিল, সেই সব অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং অনুগত কর্মচারীদের বিদায় করে নতুন লোক রাখা হয়েছে। এমন কি তাঁদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক চিকিৎসকের বদলে অন্য ডাক্তার তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছিল, সর্বক্ষণ প্রবীণ বা প্রভা, কেউ না কেউ তাঁর কাছে থাকে।

পুরনোদের সরিয়ে নতুন ডাক্তার, নার্স বা কাজের লোক মোতায়েন করা, টেলিফোন সরিয়ে দেওয়া—এ সবের কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন হেমনলিনী। আগরওয়ালরা যা উত্তর দিয়েছিল তা এইরকম। সব কিছুই নাকি তাঁর ভালর জন্য করা হয়েছে। ওদের মুখ থেকে এর বেশি কিছু বার করা সম্ভব হয়নি।

হেমনলিনী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে আগরওয়ালরা। প্রথম দিকে ভীষণ রেগে যেতেন; উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। পরে ক্রোধের বদলে এক ধরনের মারাত্মক ভীতি তাঁর ওপর যেন ভর করতে শুরু করেছিল। আত্মরক্ষার শক্তি নেই, বিশ্বাসভাজনদের সরানো হয়েছে—এই অবস্থায় রাগারাগি করলে প্রবীণরা যদি তাঁর ক্ষতি করে ফেলে? মৃত্যুভয়ে নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছিলেন হেমনলিনী। ইদানীং বেশ কিছুদিন আগরওয়ালরা যা বলে তাতেই সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রায় দু সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন একটু একটু করে এই সব তথ্য জোগাড় করার পর হেমনলিনীর লেখা চিরকুটগুলো পর পর সাজিয়ে নিয়েছিল মোহর। তারপর সুদীপ্তকে সঙ্গে করে সোজা চলে গিয়েছিল পুলিশ কমিশনার পরমেশ বসুর বাংলোয়।

পরমেশ এবং তাঁর স্ত্রী অনসূয়া দু'জনেই মোহর আর সুদীপ্তকে স্নেহ করেন। অনসূয়া একটা কলেজে ফিলজফি পড়ান। চল্লিশের ওপর বয়স হলেও এখনও যথেষ্ট সুশ্রী। তাঁর কথাবার্তা এবং ব্যবহারে আন্তরিকতা মাখানো থাকে।

হেমনলিনীর ব্যাপারটা নিয়ে কীভাবে এগুচ্ছে, রোজই ফোনে পরমেশকে

জানিয়ে দিয়েছে মোহর আর সুদীপ্ত। পরমেশের কাছ থেকে সে সব শুনেছেন অনসূয়া। 'শান্তি ভবন' সম্পর্কে ওঁরা খুবই আগ্রহী।

ড্রইং রুমে মোহরদের বসিয়ে পরমেশরা মুখোমুখি বসলেন। পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, কতদূর এগুলে?'

হেমনলিনীর লেখা চিরকুটগুলো ব্যাগ থেকে বার করে পরমেশকে দিল মোহর। বলল, 'এগুলো পড়ুন।'

পড়া হলে পরমেশ প্রশংসার সুরে বললেন, 'গুড ওয়ার্ক।'

পরমেশের কাছ থেকে কাগজের টুকরোগুলো নিলেন অনসূয়া। তিনিও দ্রুত পড়ে নিয়ে বললেন, 'দারুণ কাজ করেছ। তুমি কলেজের চাকরির চিন্তা মাথা থেকে বার করে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চে ঢুকে যাও।'

মোহর হাসল। তারপর পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার কী করব বলুন—'

পরমেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'এই ব্যাপারটার দুটো দিক আছে।'

'কী কী?'

'একটা হল লিগাল সাইড। 'শান্তি ভবন' সম্পর্কে হেমনলিনী আগরওয়ালদের সঙ্গে কী ধরনের এগ্রিমেন্ট করেছেন, নতুন করে লিজের মেয়াদ বাড়িয়েছেন, কিনা, সে সব পরিষ্কার জানা দরকার।'

'জানব কেমন করে? প্রথম এগ্রিমেন্টটার কথা হেমনলিনী দেবীর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু পরে কী হয়েছে তা তো বলতে পারছেন না।'

'প্রথম এগ্রিমেন্টের একটা কপি ওঁর কাছে থাকা উচিত। সেটা পাওয়া যেতে পারে কি?'

'বলতে পারব না।' থাকলে নিশ্চয়ই জানাতেন।'

'টার্মস কন্ডিশনগুলো জানতে পারলে ভাল হত।'

ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে মোহর। বলে, 'না জানলে কি কিছুই করা যাবে না?'

পরমেশ বললেন, 'করা যাবে না, এমন কথা কি আমি একবারও বলেছি? তোমাদের একজন লিগাল এক্সপার্টের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।'

'ভাল ল'ইয়ার আমার জানা নেই।'

'তোমার নেই। আমার এক বন্ধু আছে, নাম-করা অ্যাডভোকেট। তাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওর কাছে সব রকম সাহায্য পাবে।'

'কিন্তু—'

'বল।'

দ্বিধান্বিতভাবে সুদীপ্ত এবার বলে, 'ল'ইয়ারের ফী দেওয়া—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে পরমেশ বললেন, 'সেটা আমি বুঝব। তোমরা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে একটা কাজ করছ। নিজেদের কোনও স্বার্থ নেই। আমার বিশ্বাস অমলেশ, মানে আমার ওই বন্ধুটি ফী নেবে না। আমাদের সবাইকেই কালেক্টিভলি বাড়িটা বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।'

মোহর বলল, 'লিগাল ব্যাপারটা হল। সেকেন্ড আরেকটা দিকের কথা কী যেন বলছিলেন—'

পরমেশ বললেন, 'ও হ্যাঁ, সেটা পুলিশ অ্যাকশন। হেমনলিনী দেবী পুলিশের সাহায্য চাইলে তবেই আমাদের পক্ষে স্টেপ নেওয়া সম্ভব।'

'ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।'

'হেমনলিনী বিপন্ন, তিনি বন্দী হয়ে আছেন—এ সব তোমার মুখে শুনেছি। তাঁকে তো চোখে দেখিনি।'

মোহর ক্ষোভের সুরে বলল, 'আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

পরমেশ আদরের ভঙ্গিতে তার একটা হাত ধরে বললেন, 'ওই দেখ, মেয়েটা রেগে গেল! আমার কথাটা শেষ করতে দাও।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'তুমি যা বলেছ সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রু। ধর তোমার কথামতো আমরা 'শান্তি ভবন'-এ গিয়ে হাজির হলাম। তখন যদি উনি বলেন, না আমার সাহায্যের দরকার নেই। আগরওয়ালদের তত্ত্বাবধানে আমি চমৎকার আছি। ইন ফ্যাক্ট তোমার কাছেই শুনেছি ওরা হেমনলিনী দেবীর যথেষ্ট সেবাযত্ন করে।'

মোহর উত্তেজিতভাবে ফের কী বলতে যাচ্ছিল, পরমেশ বলতে দিলেন না। তিনি থামেন নি, 'তোমাকে একটা খুব ইমপর্টেন্ট কাজ করতে হবে।'

'কী?'

''শান্তি ভবন'-এ ফের কবে যাচ্ছ?'

'আমি রোজই যাই, কালও যাব। কেন?'

'কাল গিয়ে হেমনলিনী দেবীকে জানাবে উনি যেন ওঁকে রক্ষা করার জন্যে পুলিশকে নিজের হাতে একটা চিঠি লেখেন। চিঠিটার নিচে নাম সই করে তারিখটা বসিয়ে দিতে হবে।'

মোহর বলল, 'কাল জানালে কালকেই চিঠি পাওয়া যাবে না। পেতে পেতে পরশু।'

পরমেশ বললেন, 'এতকাল যখন কেটেছে তখন একদিন দেরি হলে কী আর এমন ক্ষতি হবে?'

আরও খানিকক্ষণ কথা বলে অ্যাডভোকেট বন্ধুকে চিঠি লিখে মোহরকে দিতে দিতে পরমেশ বললেন, 'পারলে আজই সন্ধের পর অমলেশের সঙ্গে দেখা করো। ঠিকানা দেওয়া আছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে ওদের বাড়ি। খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে না।'

আট

সেদিনই সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বালিগঞ্জ প্লেসে অমলেশ সান্যালের বাড়িতে চলে এল মোহর আর সুদীপ্ত। মাঝবয়সী একটা কাজের লোক দরজা খুলে অনেকগুলো আলমারি বোঝাই মোটামোটা অজস্র আইনের বই আর ল'জার্নালে ঠাসা একটা প্রকাণ্ড চেম্বারে ওদের বসিয়ে বলল, 'সাহেব কোর্ট থেকে সবে এসেছেন। আপনারা এখানে বসুন। সাহেবকে আপনাদের সম্বন্ধে কী বলব?'

লোকটা বেশ আদব কায়দা জানে। সরাসরি সুদীপ্তদের নাম বা আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করল না; তবে বুঝিয়ে দিল ওগুলো জানানো দরকার। মোহর বলল, 'আমরা পুলিশ কমিশনার পরমেশ বসুর কাছ থেকে আসছি।'

পরমেশের নাম লোকটা জানে। সে তটস্থ ভঙ্গিতে বলল, 'ও, বসুসাহেব! আমি এক্ষুণি আমার সাহেবকে খবর দিচ্ছি।' বলে ব্যস্তভাবে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল।

মিনিট পনের বাদে মাঝারি হাইটের, ভারী চেহারার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে ভদ্রলোকটি চেম্বারে এসে ঢুকলেন তিনিই যে অমলেশ সান্যাল, সেটা দেখামাত্র আন্দাজ করা গেল। পরমেশেরই সমবয়সী হবেন। পরনে ঘরোয়া পোশাক—পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

সুদীপ্ত আর মোহর উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বসতে বলে একটা পুরু গদিওলা রিভলভিং চেয়ারে বসলেন অমলেশ। বললেন, 'আমার চেয়ে তোমরা অনেক ছোট। তুমি করে বললাম কিন্তু—'

মোহর বলল, 'তাই তো বলবেন। আপনি টাপনি করে বললে অস্বস্তি হবে।'

অমলেশ হেসে বললেন, 'খগেন বলল, তোমরা পরমেশের কাছ থেকে আসছ।'

মাঝবয়সী কাজের লোকটা যে খগেন সেটা বোঝা গেল। মোহর তার ব্যাগ থেকে পরমেশের চিঠিটা বার করে অমলেশকে দিতে দিতে বলল, 'হ্যাঁ। এটা

আপনাকে দিয়েছেন।'

চিঠিটা পড়ে অমলেশ বললেন, 'পরমেশ লিখেছে আমি যেন একটা জটিল কেসে তোমাদের সাহায্য করি। কেসটা কী?'

মোহর সব জানালো। শুনে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল অমলেশের। বললেন, 'এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। 'শান্তি ভবন'-এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় গৌরব জড়িয়ে আছে। ওটা বাঁচাতেই হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'আগরওয়ালকে উনি কী লিখে দিয়েছেন সেটা জানা দরকার।'

এই কথাটা পরমেশও বলেছিলেন। মোহর বলল, 'সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অমলেশ বললেন, 'হেমনলিনী দেবীকে দিয়ে তুমি তোমার নামে একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি লিখিয়ে নাও।'

'ওটা দিয়ে কী হবে?'

'ওটার জোরে তুমি আমাকে মামলা করার অধিকার দিতে পারবে।'

'উনি তো আপনাকেই তা দিতে পারেন।'

'তা পারেন। তবে যখন তখন ওঁকে পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া ওঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে দৌড়ঝাঁপ করাও সম্ভব নয়। সেটা তুমি করতে পারবে।'

'ধরুন আপনি যা বললেন তাই করলাম। আপনি কীভাবে আগরওয়ালের এগেনস্টে মামলা করবেন?'

অমলেশ হাসলেন, 'তুমি খুব ইনটেলিজেন্ট মেয়ে। না বুঝে সুঝে কিছু করতে চাও না। শোন, তুমি আমাকে এনগেজ করলে আমি আগরওয়ালকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেবো। কেননা পাঁচ বছরের লিজ পিরিয়ড তার শেষ হয়ে গেছে। যদি লিজের মেয়াদ বাড়ানো হয়ে থাকে, আদালতে সে তখন সেটা জানাবে।'

মোহর জানতে চাইল, 'যদি অসুস্থ, প্রায়-অচেতন অবস্থায় আগরওয়াল হেমনলিনীকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়ে থাকে তখন কী হবে?'

অমলেশ বললেন, 'অনেক কিছুই করা যাবে। কিন্তু আমার মতে মামলার প্রিপারেশন চলতে থাকুক। তার আগে হেমনলিনীকে রক্ষা করার জন্যে পুলিশ অ্যাকশন দরকার। সেটা পরমেশই করতে পারবে।'

মোহর কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে অমলেশ বলতে লাগলেন, 'আমি বলছি না, আগরওয়ালরা হেমনলিনী দেবীর কোনও রকম ক্ষতি করবে।

বরং আমার ধারণা, ওঁর ন্যাচারাল ডেথের জন্যই ওরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। তবে লিগাল নোটিশ পেলে ওদের মতিগতি কী দাঁড়াবে বলা মুশকিল। মানুষের মন বড় মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। অর্থ আর প্রোপার্টি এত খারাপ জিনিস যে মহাপুরুষকেও জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে।' একটু থেমে বললেন, 'বুঝলে না, সাবধানের মার নেই।'

'তা হলে সব মিলিয়ে কী দাঁড়াল?'

'প্রথমে হেমনলিনী দেবীকে আগরওয়ালদের পাহারাদারি থেকে বাঁচানো। তারপর 'শান্তি ভবন'কে রক্ষা করা। থার্ডলি ও বাড়ি থেকে প্রবীণদের বার করে দেওয়া।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অমলেশই আবার বললেন, 'মোহর, তোমার ওপর এই কেসটার অনেকখানি নির্ভর করছে।'

মোহর বলল, 'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

আশা করা গিয়েছিল, দু-চারদিনের ভেতর হেমনলিনীকে দিয়ে পরমেশের কাছে চিঠিটা লিখিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু সেটা পেতে পেতে দু সপ্তাহ লেগে গেল। কেননা হঠাৎ তিনি জ্বরে পড়ে গিয়েছিলেন।

এই ক'দিন নিয়মিত 'শান্তি ভবন'-এ গেছে মোহর। কিছুক্ষণ তাঁর খাটের পাশে বসে সাধারণ দু-একটা কথা বলে চলে এসেছে। আসলে তাঁর সঙ্গে যে যোগাযোগটা হয়েছে সেটা ছিন্ন হতে দিতে চায় না সে। তা ছাড়া আগরওয়ালরা এখন তাকে পুরোপুরিই বিশ্বাস করে। তার যে কোনওরকম দুরভিসন্ধি নেই সে সম্বন্ধে ওরা স্বামী-স্ত্রী খুব সম্ভব নিশ্চিত হয়ে গেছে।

এই দু সপ্তাহের ভেতর হেমনলিনীর দেওরের ছেলে দিবাকর মল্লিককে তাঁর আমেরিকার ঠিকানায় চিঠি লিখেছে মোহর। জানিয়েছে 'শান্তি ভবন'কে রক্ষা করা মল্লিক বাড়ির বংশধর হিসেবে তাঁরও কর্তব্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কলকাতায় চলে আসাটা খুবই জরুরি। দিবাকরের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

হেমনলিনীর আর্জিটা হাতে আসার দু'দিনের ভেতর পরমেশ ওঁদের এলাকার থানায় নির্দেশ পাঠালেন, সমস্ত ব্যাপারটা অবিলম্বে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কবে, কোনদিন স্থানীয় ওসি তাঁর লোকজন নিয়ে সকালের দিকে 'শান্তি ভবন'-এ যাবেন সেটাও তাঁকে বলে দেওয়া হল। তারিখটা মোহরকেও জানিয়ে দিলেন পরমেশ। সে যেন নির্দিষ্ট সময়টিতে হেমনলিনীর

কাছে উপস্থিত থাকে।

অন্য দিনে ন'টা নাগাদ 'শান্তি ভবন'-এ যায় মোহর। ওসি'র যেদিন যাবার কথা সেদিন সাড়ে আটটায় পৌঁছে গেল সে। পুলিশ আসার খবরটা আগেই হেমনলিনীকে জানিয়ে দিয়েছিল। তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে আছেন ; কিছুটা নার্ভাসও। তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মোহর বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও চিন্তা নেই।

আগরওয়ালরা যথারীতি এই ঘরেই হাজির আছে। ইচ্ছা করেই আজ টেপ-রেকর্ডার বার করেনি মোহর। যে কোনও মুহূর্তে সদলে ওসি এসে পড়বেন। হেমনলিনীর মতো নার্ভাস হওয়ার প্রশ্নই নেই তার, তবু নিজের মধ্যে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা টের পাচ্ছিল সে।

চুপচাপ তো আর বসে থাকা যায় না। মল্লিক বংশের অতীত কাল নিয়ে এলোমেলো প্রশ্ন করে যাচ্ছিল মোহর। হেমনলিনী অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিচ্ছিলেন।

মিনিট দশ-পনেরো এভাবে কাটার পর হঠাৎ গেটের দারোয়ানটা উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে এসে ঢুকল। তার পেছনে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে থানার ওসি এবং দু'জন আর্মড কনস্টেবল।

ভয়ার্ত সুরে দারোয়ান আগরওয়ালকে জানালো, বুড়ো মা'জি অর্থাৎ হেমনলিনী সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যে পুলিশ সাহেবরা এসেছেন।

আগরওয়ালরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রবীণ সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'মায়ের ব্যাপারে আপনারা কী জানতে চান?'

ঘরে গোটাকয়েক ফাঁকা চেয়ার পড়ে ছিল। তার একটা নিজেই টেনে নিয়ে বসে পড়লেন ওসি। বললেন, 'তার আগে সবার পরিচয় দিন।'

আগরওয়াল ঘরে যারা রয়েছে তাদের সকলের নাম জানিয়ে দিল।

ওসি মোহরকে বলল, 'আপনিই তা হলে মল্লিকবাড়ি নিয়ে ডকু-ফিচার করছেন?'

মোহর বুঝতে পারল, পরমেশ ওসিকে তার সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। বলল, 'আমি একাই না। আমাদের একটা প্রোডাকশন ইউনিট আছে; তারাই ওটা করবে। আমার কাজ হল তথ্য জোগাড় করা। সেই উদ্দেশ্যেই কিছুদিন ধরে রেগুলারলি আমি এখানে আসছি।' একটু থেমে বলল, 'আপনি আর্জেন্ট ব্যাপারে এসেছেন। আমার এ ঘরে থাকাটা কি ঠিক হবে?'

'কোনও অসুবিধে নেই। আপনি থাকুন।' বলে আগরওয়ালের দিকে তাকালেন ওসি, 'মিস্টার আগরওয়াল, আমাদের কাছে অভিযোগ আছে, আপনি এবং আপনার স্ত্রী প্রভাদেবী জোর করে হেমনলিনী দেবীকে এই ঘরে আটকে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে বাইরের কাউকেই যোগাযোগ করতে দেন না। মিস মোহর দাশগুপ্ত পুলিশ কমিশনারের চিঠি না নিয়ে এলে তাঁকেও এ বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না।'

আগরওয়াল এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়েও পারল না। তার কপালে ঘাড়ে দানা দানা ঘাম ফুটে উঠতে লাগল।

ওসি আবার বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, অসহায় বৃদ্ধ হেমনলিনী দেবীর মৃত্যু হলে 'শান্তি ভবন' পুরোপুরি দখল করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবেন।'

এতক্ষণে খানিকটা সামলে উঠেছে আগরওয়াল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'মিথ্যে মিথ্যে, এমন অভিযোগ কেউ করতে পারে না।'

ওসি বললেন, 'লিখিত অভিযোগের কপি আমার কাছে আছে।'

আগরওয়াল থতিয়ে গেল, 'লিখিত অভিযোগ? কে করেছে?'

খাটের মাঝখানে শায়িত হেমনলিনী দেবীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে ওসি বললেন, 'উনি।'

ঘরের ভেতর আচমকা একটা বাজ পড়ল যেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আগরওয়াল। তারপর গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'অসম্ভব। উনি আমার মা; এরকম অভিযোগ করতেই পারেন না।' হেমনলিনীকে বলল, 'কী মা, করেছেন?'

ওসি কড়া গলায় বললেন, 'ওঁর সঙ্গে কোনও কথা নয়।' হেমনলিনী দেবী পুলিশ কমিশনারকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন তার একটা জেরক্স কপি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা আগরওয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাতের লেখাটা চিনতে পারছেন?'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আগরওয়াল। বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করে ঝাপসা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

ওসি বললেন, 'এটা পড়ে দেখুন—'

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পড়ার পর একবার হেমনলিনী, একবার ওসি'র দিকে তাকাতে লাগল আগরওয়াল। এত নজরদারির মধ্যেও কীভাবে হেমনলিনীর চিঠি পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছুল সে কিছুতেই

ভেবে উঠতে পারছে না।

ওসি বললেন, 'হেমনলিনী দেবীকে আপনাদের আর দেখাশোনা করতে হবে না। তাঁর ঘরে ঢোকার কোনওরকম চেষ্টা করবেন না। আপনি যে নার্সটিকে রেখেছেন তাকে আর দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আমার মাকে দেখাশোনা—'

আগরওয়ালকে থামিয়ে দিয়ে ওসি বললেন, 'হেমনলিনী দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে ওঁর দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হবে। আরেকটা কথা শুনুন, এ বাড়ি আপনাদের ছাড়তে হবে।'

আগরওয়াল এই প্রথম রুখে দাঁড়াল, 'মা আমাদের লিজ দিয়েছেন। পুলিশ বাড়াবাড়ি করলে কোর্টে যাব।'

'নিশ্চয়ই। কোর্টের দরজা শুধু আপনার জন্যেই খোলা নেই। হেমনলিনী দেবীও দরকার হলে সেখানে যাবেন। এখন আপনারা নিচে যান। এ ঘরে যে টেলিফোনটা ছিল কাজের লোককে দিয়ে সেটা পাঁচ মিনিটের ভেতর পাঠিয়ে দেবেন।'

নিরুপায় আগরওয়াল চাপা আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে প্রভা এবং নার্সটিকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেমনলিনী দেবীর সঙ্গে কথা বলে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনে ফোন করে তক্ষুণি সর্বক্ষণের জন্য একজন নার্স ঠিক করা হল। পাহারা দেবার জন্য একটি আর্মড কনস্টেবল এ বাড়িতে দিনরাত থাকবে। তাছাড়া মল্লিক পরিবারের অনুগত কর্মচারী জয়দেব চৌধুরীকে ডাকিয়ে এনে সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

নয়

আজ সকালে ওসি যাবার পর 'শান্তি ভবন'-এ যা যা ঘটেছে পরমেশকে সমস্ত জানিয়ে সন্ধের পর সুদীপ্ত আর মোহর অমলেশের বাড়ি এসে দেখা করল। তাঁকেও সব জানানো হল।

অমলেশ বললেন, 'সুপার্ব। তোমাদেরও একটা সুখবর দেবার আছে।'

উৎসুক সুরে মোহর জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমরা সেদিন চলে যাবার পর থেকে ভাবছিলাম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট না করে কীভাবে 'শান্তি ভবন'কে বাঁচানো যায়। কিছুদিন ধরেই করপোরেশন পুরনো হেরিটেজ বিল্ডিংগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। মেয়রের সঙ্গে সামান্য জানাশোনা ছিল। তাঁকে ফোন করলাম, পেয়েও গেলাম। 'শান্তি ভবন'-এর সমস্যা জানালাম। উনি বললেন, যেভাবেই হোক বাড়িটাকে বাঁচাতে হবে। আসছে সপ্তাহে সময় দিয়েছেন। ডিটেলে সব শুনবেন। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে।'

মোহর উচ্ছ্বসিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ তো দারুণ ব্যাপার।'

অমলেশ বললেন, 'বাড়িটা বেঁচে যাবে। এরপর আগরওয়ালদের 'শান্তি ভবন' থেকে বার করতে হবে। সেটা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি হবে না। খানিকটা সময় লাগবে।'

একটু নীরবতা।

অমলেশ এবার মোহরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঙালির গ্লোরিয়াস অতীতের একটা টুকরো যে বাঁচানো যাবে সেটা শুধু তোমারই জন্যে। কনগ্র্যাচুলেশনস।'

মোহরের চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

জাহান্নামের গাড়ি

পার্ক সার্কাসের একধারে পুরনো আমলের এই ছিরিছাঁদহীন একতলা বাড়িটার বয়স যে কত, ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনও হয়তো তার হদিশ দিতে পারবে না। সত্তরও হতে পারে, আশি নব্বই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। লম্বা ধাঁচের পর পর চারটে বেঢপ ঘর, যার কোনওটাই আস্ত নেই—সব ভাঙাচোরা, নোনা-লাগা, শ্যাওলা-ধরা। চারপাশের দেওয়াল থেকে আস্তর খসে খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। প্রতিটি ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় অজস্র চিড়।

বাড়িটার একদিকের দু'খানা ঘর নিয়ে পঞ্চাশ বছর ধরে আছে মাসুদ জান গাড়িওলা আর তারই কাছাকাছি বয়সের একটা মোটর, যার চাকাগুলো বিরাট বিরাট, সামনে বড় বড় গোল হেডলাইট, মাথায় ক্যানভাসের হুড, ডানধারে ড্রাইভারের সিটের লাগোয়া জানালাটার পাশে আড়াই প্যাঁচওলা বিউগলের ধরনে হর্ন—পুরনো ভিনটেজ কার যাকে বলে তা-ই। গাড়িটার আদি চেহারা মোটামুটি একই রকম রয়েছে। তবে তার ইঞ্জিন, মাড গার্ড, স্টিয়ারিং, সিটের গদি বহু বার পালটাতে হয়েছে। মাসুদ জান বাড়ির যেধারে থাকে তার সামনের ফাঁকা জায়গায় টুটোফুটো টিনের চালা বানিয়ে তার তলায় গাড়িটাকে রাখা হয়। হাত-পা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো এটা তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, অচ্ছেদ্য কোনও বন্ধনে। মাসুদ জান নিজেও বলে, এই গাড়ি তার জান, তার কলিজার টুকরা।

অনেক বছর আগে, তার যৌবনে, একটা শাদিও হয়েছিল মাসুদ জানের। গোটা দুই ছেলেমেয়েও জন্মেছিল। তারা কেউ টেকে নি, কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে। কিন্তু মাসুদ জান আছে, আর আছে তার এই গাড়িটা। এছাড়া এত বড় দুনিয়ায় আর কেউ নেই তার। বিবি, বেটা বা বিটিয়ার মুখ আজকাল ভাল করে মনেও পড়ে না। তাদের স্মৃতি একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে।

বাড়িটার বাকি দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে ফজলু মিঞা, তার বিবি রেহানা এবং তাদের দুটো বাচ্চা। বাজারে ফজলুর ছোটখাটো ফলের কারবার।

মাসুদ জান এ বাড়ির চিরস্থায়ী বাসিন্দা হলেও অন্য ঘর দুটোয় মাঝে মাঝেই ভাড়াটে বদলে যায়। পঞ্চাশ বছরে কত জন যে এল তার কোনও লেখাজোখা

নেই। তিন সাল আগে এসেছিল ফজলুরা। ওরা মানুষ ভাল—বিনয়ী, ছা-পোষা, নির্ঝঞ্ঝাট। মাসুদ জানকে খুবই খাতির করে।

বাড়িটার সামনে দিয়ে পনেরো ফুট চওড়া একটা গলি জিলিপির প্যাঁচের মত পাক খেতে খেতে চলে গেছে। ওটার এক মাথায় ট্রাম রাস্তা, আরেক মাথায় রেল-লাইন। দু'ধারে ইটের দেওয়াল আর টিনের চালের সারবন্দি ঘরবাড়ি। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ সাবেক কালের কিছু একতলা, দোতলা বা তেতলা, যেগুলোর খড়খড়ি লাগানো জানালার মাথায় বাহার খোলার জন্য আধখানা চাঁদের আকারে লাল-নীল সবুজ রঙের কাচ বসানো। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনের দিকে নানা ধরনের দোকানপাট—কোনওটা সস্তা রুটি-মাংসের, কোনওটা পান-বিড়ির, কোনওটা ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জামের, কোনওটা বা মুদিখানা। এছাড়া রয়েছে চায়ের দোকান, দাওয়াখানা, মোটর মেরামতি আর লেদ মেশিনের ছোটখাটো কারখানা।

এলাকাটা পনেরো বিশ বছর আগেও বেশ নিরিবিলি ছিল। এখন লোকজন প্রচুর বেড়ে গেছে। রাস্তায় সারাক্ষণ গিজগিজে ভিড়। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা, কারণে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি, খিস্তিখেউড়। যেদিকে তাকানো যাক, আবর্জনা পচে ডাঁই হয়ে আছে। তীব্র দুর্গন্ধে এখানকার বায়ুমণ্ডল দিবারাত্রি বিষাক্ত হয়ে থাকে।

রোজ অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় মাসুদ জান। কিন্তু আজ অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে পড়েছে। তারপর স্নান চুকিয়ে সামনের দিকের টিনের চালার তলায় যেখানে তার গাড়িটা থাকে তার পাশে একটা চৌপায়ায় বসে আছে। কাল রাতে ফজলুদের ঘর থেকে তিনখানা হাতল- ভাঙা চেয়ার চেয়ে এনে চৌপায়াটার সামনে সাজিয়ে রেখেছিল। তা ছাড়া চার-পাঁচটা কোল্ড ড্রিংকসের বোতলও কিনে এনেছিল; সেগুলো ঘরের ভেতর রয়েছে। আজ সকালে যে কোনও সময় রঘুবন্ত সিং এই গরিবখানায় পা রাখবেন। রঘুবন্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়, অঢেল পয়সাওলা, রইস লোক। প্রচুর জমিজমার মালিক তিনি; তা ছাড়া নানা রকমের কলকার-খানা আর 'বিজনেস'ও আছে। মাসুদ জানের পুরনো গাড়িটার খবর পেয়ে কাল পাটনা থেকে কলকাতার একটা নাম-করা হোটেলে এসে উঠেছেন। তাঁর পাঠানো একটা লোক কাল রাতেই এসে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আজ সকালে তিনি সবান্ধবে এসে হাজির হবেন। তাঁর খাতিরদারির জন্য চেয়ার আর কোল্ড ড্রিংকসের ব্যবস্থা করে রেখেছে মাসুদ জান।

হিন্দুদের বড় পুজোর ধুমধাম ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। তার পর থেকেই

এ বছর হিম পড়তে শুরু করেছে। উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। সেই হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ জড়ানো, গায়ে লাগলে সিরসির করে। এই সিরিসিরানিটুকু ভারি সুখদায়ক। খানিক আগে রোদ উঠে গিয়েছিল। তবু একটা লক্ষ করলে দেখা যাবে, অনেকদূরে আকাশের গায়ে চিকন সাদা ওড়নার মতো এখনও সামান্য কুয়াশা লেগে রয়েছে।

চারপায়ায় বসে মাঝে মাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল মাসুদ জান, পরক্ষণেই তার দুই চোখ ফিরে আসছিল পুরনো গাড়িটার দিকে। এখন তাকে দেখলে টের পাওয়া যাবে, ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন চাপা উত্তেজনা চলছে। নাকি অস্থিরতা, কিংবা অন্য কিছু?

তার বয়স কবেই সত্তর পেরিয়ে গেছে। প্রায় চার হাতের মতো লম্বা। বয়সের কারণে শরীরের মাংস ঝরে ঝরে মাসুদ জানকে খুব রোগা আর ঢ্যাঙা দেখায়। দুই হাতের মোটা মোটা শিরা, কণ্ঠা এবং গালের হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে যেন। একসময় রং ছিল টকটকে। চামড়া কুঁচকে, ঢিলে হয়ে মাকড়সার জালের মতো সরু সরু, সূক্ষ্ম কালচে দাগে ভরে গেছে সারা গা। এই বয়সেও চোখের নজর কিন্তু যথেষ্ট সতেজ আর শিরদাঁড়া টান টান। মাথার চুল ধবধবে সাদা। লম্বা, ঘন, ঢেউখেলানো দাড়িতে মেহেদি মাখানো। চোখে সরু করে সুর্মার টান। স্নানের পর সুর্মা আর মেহেদি লাগানো তার বহুকালের অভ্যাস। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে মোতি বাঈ, গর্দানি বাঈ বা জহুরা বাঈ এবং তাদের বাবুদের সামনের ওই গাড়িতে তুলে যখন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেত তখন থেকেই এই অভ্যাসের শুরু। যে গাড়ির সওয়ার পরমাশ্চর্য সব বাঈজীরা, যাদের জমকালো সাজের বাহার আর রূপের ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিত, তার চালকের গায়ে থাকবে সাদামাঠা, ম্যাড়মেড়ে জামা-প্যান্ট, তা তো আর হয় না। আরোহিণীরাই তাদের সঙ্গে মানিয়ে যায়, এমন পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে মাসুদ জানের পরনে সাদা ঢোলা পাজামা যার তলার দিকটা চাপা, আর লম্বা ঝুলের শেরওয়ানি। মাথায় জর্জেটের পাগড়ি, যেটার এক দিক কুঁচিয়ে জাপানি পাখার মতো উঁচু করে রাখা হয়েছে। ওইভাবে সেজেই বছরের পর বছর বাঈজীদের গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে।

এরকম সাজসজ্জা করে কেউ নিজের বাড়িতে বসে থাকে না। মাসুদ জান যে সেটা করেছে তার কারণ একটাই। প্রথম নজরেই যেন রঘুবন্ত সিং টের পেয়ে যান মামুলি এক ড্রাইভারের কাছে তিনি আসেননি।

ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাসুদ জানের পাগড়ি বা শেরওয়ানির নানা জায়গায় পিঁজে পিঁজে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বার বার রিপু করিয়েও সেগুলোর দুর্দশা ঠেকানো যায়নি। বেশ বোঝা যায় সে খুব কষ্টে আছে। আজকাল তার গাড়িটার কদর নেই। পঞ্চাশ বছর আগের সেই বাবু, বিবি আর বাঈজীরা কি আছে যে এর মর্যাদা দেবে? এখন নতুন নতুন মডেলের গাড়ি বেরিয়েছে; সে সব নিয়ে লোকে মাতোয়ারা। অন্য সব পুরনো জিনিসের মতো তার এই মোটর আর সে স্রেফ বাতিলের দলে। ইদানীং কেউ তার খোঁজও নেয় না। গাড়ি না চালাতে পারলে যা হয়, রোজগার প্রায় বন্ধ। বছরে দু'বার পুরনো গাড়ি অর্থাৎ ভিনটেজ কারের যে র‍্যালি হয় তাতে নাম দেয় মাসুদ জান। ফার্স্ট প্রাইজটা তার বাঁধা। দু'বার প্রাইজ হিসেবে কাপ আর কিছু নগদ টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমানো রয়েছে, তার সুদও যৎকিঞ্চিৎ মেলে। এইভাবে কোনওরকমে দিন কেটে যাচ্ছে। তবে সব মিলিয়ে তার যেটুকু আয় তার বেশ খানিকটা গাড়ির পেছন খরচ হয়ে যায়।

চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝেই গাড়িটাকে রাস্তায় বার করে মাসুদ জান। আর তখনই পুরনো ক্ষয়রোগীর মতো হাজারটা উপসর্গ ধরা পড়ে। গ্যারাজে নিয়ে গেলে ওরা বলে এটা পালটাও, ওটা পালটাও। গাড়িটা তার জেরবার করে ছাড়ছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বহুবার পরামর্শ দিয়েছে এই জঞ্জালটা বিদায় কর। ভিনটেজ কারের শখ যাদের, তারা কেউ কেউ গাড়িটা কিনতেও এসেছিল। কিন্তু মাসুদ জানের একটাই শর্ত, গাড়ির সঙ্গে তাকেও ড্রাইভার হিসেবে নিতে হবে। যতদিন সে বেঁচে আছে সেটা অন্য কেউ চালাক, একেবারেই পছন্দ নয় তার। কিন্তু গাড়ি পছন্দ হলেও সেই সঙ্গে তার চালকটিকে নিতে কেউ রাজী হয়নি।

রঘুবন্ত সিং ঠিক কী চান, মাসুদ জানের জানা নেই। সে জন্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। নিজের শর্ত তাকে জানিয়ে দেবে সে। রঘুবন্তজি যদি রাজী হন, সমস্যা নেই। তবে গাড়িটা কেনাই যদি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাঁকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে।

রঘুবন্ত সিংরা এলেন বেশ খানিকটা বেলা করেই। ততক্ষণে সকালের গা থেকে কুয়াশার ওড়না মুছে গেছে; রোদের তাত আর জেল্লা আরও কিছুটা বেড়েছে।

এই আমলের ঝকঝকে মডেলের একটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামতেই

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ জান। মোটর থেকে তিনজন নামতে সে কয়েক পা এগিয়ে যায়। দু'জনের পরনে বিহারি ধরনে পরা ধুতির ওপর গরম পাঞ্জাবি, পায়ে মোটা চামড়ার পাম্প-শু। তাদের মজবুত চেহারা, চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। একজনের মুখ চৌকো, আরেকজনের লম্বাটে। দু'জনেরই চোখেমুখে হিংস্রতা যেন লুকানো রয়েছে। তৃতীয় লোকটির ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিশাল শরীর; গোলাকার মুখ, লালচে চোখ, কাঁধ পর্যন্ত লতানো চুল। পরনে দামী সিল্কের চুস্ত আর কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি যার বোতামে হীরের ঝলক। দু'হাতের আটটা আঙুলের তিনটে আংটিতেও হীরে বসানো; বাকিগুলোতে চুনি, পান্না, গোমেদ ইত্যাদি। গলায় সোনার সরু হার, বাঁ হাতের কবজিতে সোনার ব্যান্ডে বিদেশী দামী ঘড়ি। তার সারা শরীর থেকে ভুর ভুর করে দুর্লভ সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে। ইনিই যে রঘুবন্ত সিং সেটা মাসুদ জানের সত্তর বছরের অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে শনাক্ত করে ফেলে। হঠাৎ পয়সাওলাদের গায়ের গন্ধ, তাকানো, হাঁটার চালে এমন কিছু থাকে যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্য দু'জন যে তার অঙ্গরক্ষক বা বডিগার্ড এবং মোসাহেব, একালের ভাষায় চামচা, সেটাও টের পাওয়া যায়।

রঘুবন্তদের সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। সে ওঁদের ড্রাইভার, গাড়ি থেকে সে নামেনি। কাল রাতে এই লোকটাই তাকে খবর দিয়ে গিয়েছিল। মাসুদ জান বিনীতভাবে বলে, 'আদাব। আইয়ে আইয়ে—'

রঘুবন্ত মাসুদ জানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলে, 'আপ মাসুদ জান?'

লোকটার গা থেকে টাকার গরম বাষ্প বেরিয়ে এলেও দেখা যাচ্ছে কিঞ্চিৎ সহবত জানে। তার মতো বয়স্ক মানুষকে তুমি করে যে বলেনি, তাই যথেষ্ট। মাসুদ জান মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'জি—'তারপর খাতির করে তিনজনকে এনে চেয়ারে বসায়। দৌড়ে ঘর থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলগুলো নিয়ে এসে চাবি দিয়ে খুলে সবার হাতে একটা করে দেয়।

রঘুবন্ত সিং বোতল নেন বটে, তবে পানীয় স্পর্শ করেন না। বোতলটা নিচে নামিয়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে টিনের চালার তলায় গাড়িটা দেখতে থাকেন। বলেন, 'আপনার এই পুরনো মোটরটার খবর আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'জি—'

'শুনেছি হর সাল গাড়িটা কার রেসে ফার্স্ট হয়।'

'জি—'

'আখবরে এর ছবিও বেরিয়েছিল। বন্ধু সেটাও আমাকে দেখিয়েছে।'

'জি—'

হঠাৎ উঠে গিয়ে চারপাশ ঘুরে গাড়িটার হর্ন, সিট, হেডলাইট খুঁটিয়ে দেখে এসে ফের চেয়ারে বসতে বসতে রঘুবন্ত বলেন, 'মোটরটা তোয়াজে রেখেছেন দেখছি।'

মাসুদ জান খুশি হয়ে পুরনো, বহুবার-বলা সেই কথাগুলো আউড়ে যায়, 'জি বাবুসাব, গাড়িটা আমার কলিজার টুকরা—'

রঘুবন্ত বলেন, 'এটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

'বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া বাবুসাব।'

কেউ তার গাড়ির তারিফ করলে দিল তর হয়ে যায় মাসুদ জানের। উচ্ছ্বাসের গলায় লাগাতার সে যা বলে যায় তা এইরকম। তার গাড়ির খানদান, চাল, ঐতিহ্য, এসব বোঝার মতো মানুষ আজকাল নেই বললেই চলে। রুচি-টুচি সব পালটে গেছে। এখন ঠুনকো, পলকা, কারুকার্যহীন জিনিসের দিকে লোকের ঝোঁক। আভিজাত্য বা বনেদিআনা ব্যাপারগুলোর দাম কানাকড়িও নয়। বাবুসাব রঘুবন্ত সিংয়ের মতো সত্যিকারের সমঝদার অনেক সাল বাদে সে দেখতে পেল। অজস্র বার ধন্যবাদ জানিয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'বাবুসাব, এবার বলুন গাড়িটার ব্যাপারে আপনি কী ভেবেছেন?'

রঘুবন্ত বলেন, 'ওটা আমি কিনতে চাই।'

একটু চুপ করে থাকে মাসুদ জান। তারপর বলে, 'ঠিক হ্যায় বাবুসাব। আমার বহুৎ উমর হয়ে গেছে। মৌত তো একদিন আসবেই। মরার আগে গাড়িটা একজন সমঝদার আদমির হাতে পড়লে ভাল লাগবে।লেকেন—'

'কী?'

'আমার একটা শর্ত আছে।'

তার কথা ভাল করে না শুনেই হাত তুলে রঘুবন্ত সিং বলেন, 'দামের জন্যে ভাববেন না। যা কিম্মত চাইবেন তাই পাবেন—'

মাসুদ জান বলে, 'টাকার কথা ভাবছি না বাবুসাব—'

থমকে যান রঘুবন্ত। কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন,.'তা হলে?'

'গাড়ির সঙ্গে আমাকে নিতে হবে।'

'মতলব?'

মাসুদ জান তার শর্তটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। অন্য ড্রাইভার এ গাড়ি চালায়, সেটা একেবারেই চায় না সে। যতদিন বেঁচে আছে, নিজেই চালিয়ে যাবে।

তীক্ষ্ণ চোখে ধীরে ধীরে মাসুদ জানকে আরেক বার লক্ষ করেন রঘুবন্ত। বলেন, 'আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন?'

মাসুদ জান জানায়, তার শরীরে যে তাকত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাতে আরও দশটা সাল অক্লেশে ড্রাইভ করতে পারবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর।'

'বহুৎ সুক্রিয়া। বাবুসাব, এই গাড়িতে চড়লে বুঝবেন আরাম কাকে বলে। নিজের জিনিস বলে মনে করবেন না বাড়িয়ে বলছি। এমন উমদা, খানদানি চিজ নসিবে না থাকলে মেলে না।'

আচমকা বিপুল শরীরে তুফান তুলে হেসে ওঠেন রঘুবন্ত। মাসুদ জান যা বলেছে তেমন মজাদার কথা বুঝিবা আগে আর কখনও শোনেননি।

'কী হলে বাবুসাব?' রীতিমত হকচকিয়ে যায় মাসুদ জান।

রঘুবন্ত হাসতেই থাকেন। দেখাদেখি তাঁর দুই মোসাহেবও পাল্লা দিয়ে হাসে।

ভীষণ জড়সড় হয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'আমার কি কোনও কসুর হল বাবুসাব?'

দুই হাত এবং মাথা প্রবলবেগে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রঘুবন্ত বলেন, 'আরে নেহী—নেহী—'

'তবে?'

হাসতে হাসতেই পুরনো গাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রঘুবন্ত সিং বলেন, 'মিঞা, আপনার কি ধারণা আমি ওই লক্কড় টিনের খাঁচাটায় চড়ব?'

যে মানুষ খানিক আগে গাড়িটার এত তারিফ করেছেন তাঁর মুখে এমন একটা মন্তব্য শুনে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় মাসুদ জানের। বলেন কিনা লক্কড় টিনের খাঁচা! বিষণ্ণ সুরে সে বলে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হাঁ হাঁ, করুন।'

'যদি না-ই চড়েন, গাড়িটা কিনতে চাইছেন কেন?'

'চম্পার জন্যে, সে চড়বে।'

ব্যাপারটা মাসুদ জানের মাথার ভেতর গুলিয়ে যায়। সে অবাক হয়ে বলে, 'চম্পা!'

রঘুবন্ত একটু জোর দিয়ে বলেন, 'হাঁ, চম্পা—'

'সে কে?'

এবার ডান পাশে যে চৌকো মুখওলা লোকটা বসেছিল রঘুবন্ত সিং তার দিকে ফিরে বলেন, 'গণপত, মিঞাকে সমঝিয়ে দাও তো চম্পা কে?'

গণপত পরিষ্কার করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয়। চম্পা হল রঘুবন্ত সিংয়ের রাখনি অর্থাৎ রক্ষিতা। পাটনা থেকে পঞ্চাশ মাইল পুবে যে পুরনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনটা রয়েছে, যার নাম কামতাপুর। সেখানে রঘুবন্তজির তিনটে রাইস মিল, একটা সুগার ফ্যাক্টরি আর একটা প্ল্যাস্টিকের কারখানা রয়েছে। ওখানে নয়া দোতলা বাড়ি বানিয়ে চম্পার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। পুরনো গাড়ির ভারি শখ চম্পার। তার আবদার মেটাতে ভূ-ভারত ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে শেষ পর্যন্ত মাসুদ জানের এই গাড়িটার খোঁজ পেয়েছেন তিনি।

গণপতের কথা শেষ হতে না হতেই রঘুবন্ত সিং আরেকটু জুড়ে দেন। চম্পা হল খানদানী ঘরানার মেয়ে। তার মা হীরাবাঈ, নানী পান্নাবাঈ, তার মা পিয়ারীবাঈ—সাতপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ের বাঈমহল্লা এরা আলো করে ছিল। যা কিছু পুরনো, প্রাচীন, জমকালো এবং অভিজাত, সে সব তাদের পছন্দ। তা হীঁরের গয়নাই বল, কি কাশ্মীরের পশমিনা, কি জরির ফুল-বসানো বেনারসী শাড়ি বা সাবেক কালের চাঁদির ফরসি অথবা জাফরি আর জানলায় রঙিন কাচ-বসানো বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন, রুপোর কারুকার্যময় বাসন কিংবা গাড়ি। এমন বনেদি যার বংশলতিকা তার দু-একটা শখ না মেটাতে পারলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতে হয়।

রঘুবন্ত থামেননি, একনাগাড়ে বলে যান, 'মিঞা, আপনাকে গাড়ি নিয়ে কামতাপুরে চম্পার কোঠিতে গিয়ে থাকতে হবে। রোজ বিকেলে সে হাওয়া খেতে বেরোয়। যেখানে যেতে চায়, ঘুরিয়ে আনবেন।'

এতক্ষণ গাড়ির আলোচনায় এতটাই ডুবে ছিল মাসুদ জান যে খুব ভাল করে রঘুবন্তকে লক্ষ করেনি। মার্কামারা শরাবি আর লম্পটদের চেহারায় আলাদা রকমের একটা ছাপ থাকে। পঞ্চাশ বছর ধরে এই জাতীয় লোক ছাড়া সৎ, সাচ্চা, চরিত্রবান মানুষ খুব একটা দেখেনি সে। রঘুবন্ত যে পয়লা নম্বরের একটি লুচ্চা সেটা তার কথায় টের তো পাওয়া গিয়েছিলই, তার চোখেমুখেও লাম্পট্যের স্থায়ী মোহর দাগানো রয়েছে।

মনে মনে একটু হাসে মাসুদ জান। তার গাড়িতে চিরকাল বেশ্যা আর বাঈজীরাই চড়েছে। এই শেষ বয়সে রঘুবন্ত সিংয়ের 'রাখনি'ও চড়বে। নাঃ, পরম্পরা ঠিকই থাকছে।

মাসুদ জান বলে, 'জানি বেয়াদপি হয়ে যাচ্ছে। তবু জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি কামতাপুরে থাকেন না?'

রঘুবন্ত বলেন, 'না, আমি পাটনায় বেশির ভাগ সময় থাকি। মাঝে মাঝে

কামতাপুরে যাই।'

পয়সাওলা বড়লোকেরা নানা জায়গায় মেয়েমানুষ রাখে। রঘুবন্ত পাটনায় আরেকটি 'রাখনি' পোষেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না মাসুদ জানের।

রঘুবন্ত এবার বলেন, 'তা হলে বাত পাক্কা হয়ে গেল, আপনি কামতাপুরে আসছেন।'

মাসুদ জান ভাবে, গাড়িটা এখানে পড়ে পড়ে তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সে বেঁচে আছে, প্রাণ ধরে এটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। হঠাৎ ওপরওলার মেহেরবানিতে রঘুবন্ত সিংয়ের মতো রইস আদমি যেচে বাড়িতে চলে এসেছেন এবং তার শর্তে রাজী হয়ে গেছেন। শেষ বয়সে তার আর তার গাড়িটার মোটামুটি গতি হতে চলেছে। একটাই শুধু আক্ষেপ, পঞ্চাশ বছর যে শহরে কাটলো সেটা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হঠাৎ মাসুদ জানের মনে হল, সে আমলের গর্দানীবাঈ, জহুরাবাঈ কি হীরাবাঈরা মানুষ হিসেবে ছিল চমৎকার। দরাজ দিলের অধিকারিণী এইসব আওরতেরা তার সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করত। কেউ ডাকত ভাইসাব, কেউ বলত চাচা। আর দু'হাতে কত টাকা যে তাকে দিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু একালের চম্পার রুচি কেমন, হালচাল কী ধরনের, সহবত জানে কিনা, বয়স্ক লোকেদের কতটা সম্মান দেয়—এসব কিছুই জানা নেই মাসুদ জানের। তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যদি সম্ভব না হয়? সেটা হবে খুবই মুশকিলের ব্যাপার।

মাসুদ জান স্থির করে ফেলে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সে কামতাপুরে চিরকালেব মতো চলে যাবে না। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থেকে দেখবে। তারপর যদি মন বসে যায় তখন দেখা যাবে।

রঘুবন্ত সিং বলেন, 'কী হল, চুপ করে আছেন যে? আপনার শর্ত তো আমি মেনেই নিয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'ঠিক আছে বাবুসাব, আমি কামতাপুর যাব। কবে যেতে বলেন?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়। আজ পারলে আজই চলে যান।'

'আজ হবে না। সাত রোজ পরে যাব।'

একটু চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এবার বলুন গাড়ির দাম কী দিতে হবে?'

মাসুদ জান বলে, 'এখন আমি কিছুই নিচ্ছি না। আগে কামতাপুর যাই, তারপর এ নিয়ে কথা হবে।'

রঘুবন্ত চতুর লোক। সে বলে, 'সমঝ গিয়া। কামতাপুর গিয়ে শহর, সওয়ারনী পসন্দ হলে দাম ঠিক করবেন, তাই তো?'

মাসুদ জান হাসে, উত্তর দেয় না।

রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর। যা চাইছেন, তাই হবে। এতদূর যাবেন, রাস্তায় খরচ আছে। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই?'

মাসুদ জান বলে, 'আপকা মেহেরবানি।'

রঘুবন্ত পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে দু'হাজার টাকা বাড়িয়ে দেন।

মাসুদ জান মাত্র তিনখানা একশ টাকার নোট নিয়ে বাকিটা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অত দরকার হবে না।'

রঘুবন্ত এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেন না। কামতাপুরে কীভাবে যেতে হবে, চম্পার বাড়িটা শহরের কোন মহল্লায়, সব জানিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি চম্পাকে খবর পাঠিয়ে দেব। আপনার কোনওরকম অসুবিধা হবে না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

রঘুবন্ত এবং তাঁর মোসাহেবদের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত চলে আসে মাসুদ জান ; ওঁরা যতক্ষণ না গাড়িতে ওঠেন সে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই

ঠিক সাত দিন বাদে ধবধবে পাজামা-শেরওয়ানি পরে মাথায় নিখুঁত করে পাক দিয়ে দিয়ে পাগড়ি বেঁধে, একটা চামড়ার সুটকেশে কয়েকটা জামাটামা পুরে নিজের গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাসুদ জান। তার আগে ফজলুর হাতে ঘরের চাবি দিয়ে বলেছিল, সপ্তাহখানেকের জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। ফজলু আর তার বিবি যেন তার ঘরের দিকে নজর রাখে।

খুব ভোরে, তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা, রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একটা গাড়ি বা মানুষ, দু'ধারের হিমে-ভেজা বাড়িঘর অস্পষ্ট ছবির মতো দাঁড়িয়ে—রওনা দিয়েছিল মাসুদ জান। যতই তোয়াজে রাখুক, এটা তো ঠিক, তার মোটরটার বয়স হয়েছে। ফলে স্পিড তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইঞ্জিন থেকে জোরে শ্বাস টানার মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ উঠে আসছিল। মাঝেমাঝেই গাড়ির পুরো বডিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নিশ্চয়ই কোথাও

কোথাও পার্টস আলগা হয়ে গেছে। সেগুলো পালটানো দরকার।

গাড়িটায় এতটুকু গোলমাল দেখা দিলে তটস্থ হয়ে ওঠে মাসুদ জান। সর্বক্ষণ তার একমাত্র চিন্তা, কী করে ওটাকে সতেজ, নিখুঁত আর টগবগে রাখা যায়। সে চায় গাড়িটার চাল হবে মসৃণ, রাস্তা দিয়ে রাজকীয় মহিমায় অন্য সব যানকে ম্লান করে ছুটে যাবে।

আজ কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে আছে মাসুদ জান। শ্বাসকষ্টের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ বা ঢিলে হয়ে যাওয়া পার্টসের ঝকর ঝকর শব্দ তার কানে ঢুকছিল না। তার চোখের সামনে পঞ্চাশ বছর আগের টুকরো টুকরো দৃশ্য এবং কিছু মানুষজনের মুখ ফুটে উঠছিল।

তাদের বাড়ি ছিল ইলাহাবাদ থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে একটা গাঁওয়ে যার নাম আজমপুরা। ছেলেবেলায় আব্বাকে হারিয়েছিল সে। আম্মার যখন এন্তেকাল হল তখন তার বয়স বিশ। এক দূর সম্পর্কের চাচা কলকাতায় এক খাঁটি সাদা চামড়ার সাহেবের গাড়ি চালাত। সে-ই গাঁ থেকে মাসুদ জানকে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়িটায় নিয়ে আসে। নিজের হাতে ছ'মাস তালিম দিয়ে তাকে ড্রাইভিংটা ভাল করে রপ্ত করিয়ে দেয়। সেটা ইংরেজি উনিশ শ চল্লিশ সাল। কলকাতা তখন খাস বৃটিশদের খাসতালুক। বিলেতে সেই সময় জোরদার লড়াই চলছে। তার আঁচ অল্প অল্প লাগতে শুরু করেছে এই শহরে।

তালিম দেওয়ার পর মাসুদ জানের চাচা তাকে এক জাঁদরেল সাহেবের কাছে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নাম মিস্টার ব্রাউন। যে গাড়িটা চালিয়ে সে আজ কামতাপুর চলেছে, ব্রাউন সাহেব সেই চল্লিশ সালে ওটা কিনেছিলেন। এই গাড়িটা চালানোর জন্যই তাকে বহাল করা হয়েছিল। তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে এটাই চালিয়ে আসছে সে। সেদিক থেকে মাসুদ জানকে একনিষ্ঠ বলা যায়। সারা জীবনে দ্বিতীয় কোনও গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে তাকে হাত দিতে হয়নি।

ব্রাউন সাহেবের মত দু'কান-কাটা বদমাস তামাম দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায়নি। তাঁর মেমসাহেব অর্থাৎ মিসেস ব্রাউন তখন বিলেতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী একটা গোলমাল চলছিল। ফলে মিসেস ব্রাউন দেশে চলে যান। সাহেবপাড়ার গুজব তিনি আর ইন্ডিয়ায় ফিরে আসবেন না।

ব্রাউন সাহেব এমনিতে লোক খারাপ ছিলেন না। মাইনে ছাড়াও দেদার বখশিস দিতেন। দিনের বেলাটা একরকম কেটে যেত কিন্তু সন্ধের পর তাঁর মাথায় লুচ্চামি ভর করত। প্রচুর মদ টেনে মাসুদ জানকে নিয়ে এই গাড়িটায় বেরিয়ে পড়তেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের রেন্ডিখানা থেকে ডবকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান

ছুকরি বা সোনাগাছি কি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বেশ্যাখানা টুঁড়ে উচক্কা বয়সের মেয়েমানুষ তুলে নিয়ে চলে যেতেন ময়দানে কি গঙ্গার ধারে। তখন কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলত। তার স্নিগ্ধ নরম আলোয় রাতের শহরটাকে খোয়াবের হুরীর মতো মনে হত। তারই মধ্যে চলন্ত গাড়ির ব্যাকসিটে মাঝরাত পর্যন্ত নিজের জামাকাপড় খুলে এবং মেয়েমানুষগুলোকে উদোম করে, তাদের ধামসে, চটকে ব্রাউন সাহেব যে হুল্লোড় চালাতো এই সত্তর বছর বয়সেও; সেসব ভাবলে কানের লতি গরম হয়ে ওঠে মাসুদ জানের। মনে আছে, পারতপক্ষেও সে পেছন ফিরে তাকাত না; ঘাড় টানটান করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে থাকত।

সেই আমলে কেল্লায় প্রতি ঘণ্টায় ভোঁ দিয়ে সময় ঘোষণা করা হত। বারোটা বাজলে ফেরার পালা। প্রথমে ব্রাউন সাহেবের লিটল রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসত মাসুদ জান। আটটা বাজলেই দুটো বেয়ারা গেটের সামনে হামেহাল মজুদ থাকত। তারা ক্লান্ত, টলটলায়মান ব্রাউন সাহেবকে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেত। এরপর যেদিন যে মেয়েকে যেখান থেকে তোলা হত সেখানে তাকে পৌঁছে দিত মাসুদ জান। সন্ধেয় যে মেয়েগুলো থাকত তাজা, টগবগে, মধ্যরাতে তাদের দিকে তাকান যেত না। আঁচড়ানো, কামড়ানো, ক্ষতবিক্ষত মাংসের একেকটা পিণ্ড হয়ে উঠত তারা।

সবাইকে নামিয়ে পার্ক সার্কাসে ফিরতে ফিরতে রোজই একটা বেজে যেত। চাচা রমজান আলি স্নেহপ্রবণ, চমৎকার মানুষ। মাসুদ জান যতক্ষণ না ফিরত, সে অপেক্ষা করত। তারপর খেয়েদেয়ে পাশাপাশি দুই চারপায়ায় দু'জন শুয়ে পড়ত।

প্রথম প্রথম লজ্জায় ব্রাউন সাহেবের বেলেল্লা কাণ্ডকারখানার কথা রমজান আলিকে বলেনি মাসুদ জান। পরে অবশ্য যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে জানিয়েছে।

সব শুনে রমজান আলি বলেছে, 'বেটা, পেটের জন্যে আমরা গাড়ি চালাই। ড্রাইভারদের মনিবের ব্যাপারে বহিরা (কালা) আর আন্ধা হতে হয়। গাড়ি চালানো ছাড়া অন্য কোনওদিকে তাকাবে না, পেছনের সিট থেকে যদি কোনও আওয়াজ আসে কানে তুলবে না।'

রমজান আলির প্রতি মাসুদ জানের আনুগত্যের তুলনা নেই। চোখ নামিয়ে সে বলেছে, 'জি—'

'কাজ করে মাসের শেষে তলব নেব—ব্যস। এছাড়া মনিবের সঙ্গে কীসের রিস্তেদারি? সে কী করল, না করল, সেদিকে আমাদের নজর দেবার দরকার

নেই।'

'জি।'

যে দুটো বছর মাসুদ জান ব্রাউন সাহেবের গাড়ি চালিয়েছে, সেই সময়টা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার কাজ থাকত না। শুয়ে, বসে, ঘোর আলস্যে দিন কেটে যেত।

দু'বছর বাদে হঠাৎ ব্রাউন সাহেবকে বিলেতে চলে যেতে হল। যাওয়ার আগে গাড়িটা বেচে দিয়ে গেলেন বউবাজারের বিখ্যাত বাঈজী মোতিবাঈকে। ব্রাউন সাহেব পয়লা নম্বরের লুচ্চা হলেও গান বাজনার সমঝদার ছিলেন, বিশেষ করে গজলের। মাঝে-মধ্যে মোতিবাঈয়ের এক বাবুর সঙ্গে তার জমকালো কোঠিতে গিয়ে গান শুনে আসতেন।

জীবনের প্রথম গাড়ি বলেই হয়তো ওটার ওপর ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। সে ব্রাউন সাহেবের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, মোতিবাঈকে বলে তাকে ড্রাইভারের কাজটা যেন দেওয়া হয়। আর্জি মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। তার দু'নম্বর মনিব মোতিবাঈয়ের মত সুন্দরী জীবনে আগে আর কখনও দেখেনি মাসুদ জান। যেন বেহেস্তের কোনও হুরী। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ; তার চেয়ে কম করে তের চোদ্দ বছরের বড়।

মোতিবাঈয়ের সমস্ত শরীরটা যেন গোলাপের নির্যাস দিয়ে তৈরি। পদ্মের পাপড়ির মতো চোখের পাতাদুটো স্বপ্নের ঘোরে যেন সারাক্ষণ আধ-বোজা হয়ে আছে। নিখুঁত, ভরাট মুখ। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে পাতলা ফুরফুরে নাক নেমে এসেছে। রক্তাভ ঠোঁট। ডান গালে ছোট একটি তিল মুখটাকে যেন অলৌকিক করে তুলেছে। নিভাঁজ, মসৃণ গলা। দাঁত যেন মোতির সারি। কোঁচকানো চুল কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে।

মোতিবাঈয়ের পরনে সবসময় থাকত রংবেরংয়ের রেশমি সালোয়ার কামিজ বা চুড়িদার। তার নাকছাবিতে, গলার চওড়া হারে বা ব্রেসলেট কি আংটিতে শুধু পান্না আর হীরের দ্যুতি। পোশাকেও থাকত দামী দামী পাথরের ঝলক। সারা গা থেকে ভুর ভুর করে উঠে আসত আতরের খুশবু।

ব্রাউন সাহেবের মতোই মোতিবাঈয়ের কাছে তার ডিউটি ছিল সন্ধের পর। সারাদিন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে কাটিয়ে মোতিবাঈয়ের কোঠিতে চলে যেত সে। ব্রাউন সাহেবের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল এবারও তার হেরফের হয়নি। ডিউটি শেষ হলে গাড়িটা নিয়ে মাসুদ জান পার্ক সার্কাসে চলে আসত। পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওটা তার কাছেই থাকত।

ব্রাউন সাহেবের কাছে যখন মাসুদ জান ছিল, মোটামুটি পরিষ্কার পাজামা আর কুর্তা পরেই গাড়ি চালাত। কিন্তু মোতিবাঈয়ের নজর ছিল অনেক উঁচু। তার গাড়ি যেমন ঝকঝকে তকতকে থাকবে, তেমনি তার চালকের পোশাকও দামী এবং ফিটফাট হওয়া চাই। মাসুদ জানকে চার সেট ধবধবে শেরওয়ানি, কুঁচি-দেওয়া পাজামা আর পাগড়ি কিনে দিয়েছিল সে। প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছে, রোজ পাটভাঙা পোশাক পরে আসতে হবে। আজকের পাজামা-টাজামা কাল পরলে চলবে না। এর জন্য ধোবিখানার সব খরচ মাইনে ছাড়াও আলাদা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া দাড়ি-টাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই। পাগড়ির ডান ধারে জাপানি পাখার মতো যে অংশটা উঁচু হয়ে থাকে তার কুঁচিতে যেন এতটুকু খুঁত চোখে না পড়ে। পায়ের জুতোদুটো রোজ পালিশ করে চকচকে রাখতে হবে।

মোতিবাঈয়ের গলার আওয়াজটা ছিল সেতারের বোলের মতো মিষ্টি, সতেজ আর সুরেলা। প্রথম দিন সে আরও বলেছিল, 'ভাইয়া মাসুদ জান, তোমাকে আরও দু-একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে।'

মোতিবাঈয়ের রূপ ছিল আগুনের হলকার মতো, তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ যেন ঝলসে যেত। মুখ নামিয়ে মাসুদ জান শুধু বলেছে, 'জি—'

মোতিবাঈ এবার বলেছে, 'রাত্রিবেলা, দশটার পর আমি আর আরেকজন তোমার গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরুব।'

'জি—'

'তুমি স্রেফ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

'জি—'

'ভুল করেও পেছনে তাকাবে না।'

'জি—'

'যদি কিছু কানে যায় বিলকুল ভুলে যাবে।'

অর্থাৎ চাচা রমজান আলি যে সব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেগুলোই ফের শুনতে হয়েছিল। রমজান আলির মতো মোতিবাঈও বুঝিয়ে দিয়েছে, গাড়ির ব্যাক সিটের আরোহীদের সম্পর্কে তাকে কালা এবং অন্ধ হয়ে থাকতে হবে। মুখ আরও নীচু হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। আবছা গলায় এবারও সে বলেছে, 'জি—'

মনে আছে, মোতিবাঈয়ের একটি রইস বাবু ছিল। লোকটা বাঙালি, অঢেল টাকা তার। জোড়াবাগান না শোভাবাজর কোথায় যেন তাদের রাজমহলের

মতো বিশাল বাড়ি। লোকটিকে দেখতেও রাজা-বাদশার মতো। নাম দর্পনারায়ণ মল্লিক। মোতিবাঈয়ের পাশে তাঁক চমৎকার মানাত। এই দুনিয়ার ওপরওলা যেন একজনের জন্যে আরেকজনকে সৃষ্টি করেছেন।

মল্লিকবাবু আসতেন জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে ঠিক সূর্যাস্তের পর। তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড় কোঁচানো ধুতির ভাঁজ থেকে দামী বিলিতি সেন্টের যে গন্ধটা উঠে আসত আধ মাইল জুড়ে সেটা বাতাসকে যেন মাতিয়ে রাখত। ব্রাউন সাহেবের মতো তিনিও প্রচুর মদ খেতেন, চোখদুটো সারাক্ষণ লালচে আর ঢুলুঢুলু, পা দুটো টলটলায়মান। ঠোঁটের কোণে শরাবীর হাসি। তবে এটা মানতেই হবে, মদ খেলেও ব্রাউন সাহেবের মতো তিনি উদ্দাম বেলেল্লাপনা কখনও করতেন না।

মোতিবাঈ থাকত দোতলায়। মল্লিকবাবু এসে জুড়িগাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে চোখের কোণ দিয়ে একবার মাসুদ জানের দিকে তাকাতেন। ততক্ষণে সে পার্ক সার্কাস থেকে বউবাজারে এসে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। মাসুদ জান এর মধ্যে জেনে গেছে, মোতিবাঈয়েব হাত ঘুবে যে টাকাটা মাইনে হিসেবে সে পায় সেটা মল্লিকবাবুই দিয়ে থাকেন। এমন কি মোতিবাঈ যে গাড়িটা ব্রাউন সাহেবের কাছ থেকে কিনেছে তাও ওঁরই পয়সায়। কাজেই তাঁকে দেখলেই খাড়া উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকত মাসুদ জান।

মনে আছে, মল্লিকবাবু আসার অনেক আগেই সলমা-চুমকি বসানো ঘাঘরা কি চুড়িদার পরে জড়োয়া গয়নায় গা মুড়ে, একেক দিন একেক ছাঁদের চুল বেঁধে তার পাশে সোনার কাঁটা আর টাটকা বেলফুলের মালা জড়িয়ে অপেক্ষা করত মোতিবাঈ।

মল্লিকবাবু এলে বেয়ারা বাবুর্চি বা ড্রাইভারদের পক্ষে দোতলায় যাওয়া ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। জাফরিওলা বারান্দা আর লাল-নীল কাচের বন্ধ জানালার ওধারে থেকে দু-এক টুকরো গজল বা ঠুমরির কলি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসত। মোতিবাঈয়ের যে কণ্ঠস্বরে সারাক্ষণ সেতারের বোল শোনা যেত, গান গাওয়ার সময় সেটা আশ্চর্য মোহময় হয়ে উঠত।

সাড়ে আটটা, ন'টা পর্যন্ত গান বাজনার পর মোতিবাঈ মল্লিকবাবুকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে উঠে বেড়াতে বেরুত। কোনওদিন তারা যেত কার্জন পার্কের দিকে, কোনওদিন ইডেন গার্ডেনে, কোনওদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশের রাস্তাগুলোতে।

ব্রাউন সাহেবের মতো বেহেড লুচ্চা ছিলেন না মল্লিকবাবু। কোনওদিন তাঁকে মাত্রাছাড়া হুল্লোড়বাজি করতে দেখেনি মাসুদ জান। ব্যাক সিটে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে ফিসফিস করে গল্প করতেন তাঁরা। মাঝেমাঝে হাসির দু-চারটে ঝলক, বা আস্তে আস্তে কোমল খাদে গলা নামিয়ে রেওয়াজি গলায় মাতিয়ে দেওয়া মোতিবাঈয়ের একটু-আধটু গান।

মোতিবাঈয়ের এক নৌকরের কাছে মাসুদ জান শুনেছিল, মল্লিকবাবুর বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে। তবু বাঈজি না পুষলে নাকি বড়লোকি চাল বজায় থাকে না। সেকালের পয়সাওলা মানুষদের এটাই ছিল রেওয়াজ।

তবে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ব্যাপার মাসুদ জানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল; মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবু পরস্পরকে ভালবাসেন। এই ভালবাসাটা পয়সা দিয়ে কেনাবেচার জিনিস নয়, একজনের প্রতি আরেকজনের টানটা যথেষ্ট আন্তরিক।

মোতিবাঈয়ের কাছে বছর চারেক ছিল মাসুদ জান। এই দিনগুলো তার জীবনে সবচেয়ে সুখের সময়। মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবুর কাছ থেকে মাইনে ছাড়াও কত জিনিস যে পেয়েছে—দামী দামী পোশাক, গরম কোট, কাশ্মিরি শাল, আংটি, ঘড়ি—তার হিসেব নেই। এই চার বছরের মধ্যে শাদিও হয়েছিল তার। বিয়ের সময় তার বিবিকে হার-চুড়ি-আংটি, এমনি নানা জেবর দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল মোতিবাঈ। তা ছাড়া গণ্ডা গণ্ডা রেশমি সালোয়ার-কামিজ, সাজের নানা জিনিস থেকে শুরু করে ঘরকন্নার জন্য থালা-বাসন, চুলা-চাক্কি, সবই গাড়ি বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে। শাদি করা মানে খরচ বেড়ে যাওয়া। সেদিকেও নজর ছিল মোতিবাঈয়ের ; মাসুদ জানের মাইনে দেড়গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে চারটে বছর যেন হুস করে মিলিয়ে গেছে। তারপরই অঘটনটা ঘটে গেল। প্রচুর মদ খাওয়ার কারণে লিভারটা পচতে শুরু করেছিল মল্লিকবাবুর। ডাক্তাররা বহুবার তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন: মদ্যপান বন্ধ না করলে তিনি বাঁচবেন না। এই সব সতর্কবাণী তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফলে যা হবার তাই হল; হুইস্কিই তাঁকে শেষ করে ফেলল। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মল্লিকবাবুকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল মোতিবাঈ। তিনদিন বিছানা থেকে ওঠেনি সে, একটানা কেঁদেই গিয়েছিল।

বাঈজী হয়ে কেউ যে তার মৃত বাবুর জন্য শোকে এমন বিধ্বস্ত হতে পারে; দুনিয়ায় আগে কখনও শোনা যায়নি। বউবাজারের অন্য বাঈজীরা থ হয়ে গেছে।

গালে হাত দিয়ে ভেবেছে, দেখালে বটে মোতিবাঈ, এ যে শাদি-করা বিবিকেও হার মানিয়ে দিলে!

যাই হোক, মোতিবাঈ শেষ পর্যন্ত শোকটা সামলে উঠেছিল। এদিকে তার জীবনের শূন্যস্থানটা পূরণ করার জন্য কলকাতার বাবুদের লাইন লেগে গিয়েছিল। কেননা মোতিবাঈয়ের মতো বেহেস্তের হুরী আর তার মতো চমকদার গানের গলা বাঈজীপাড়ায় আর একটাও ছিল না। কিন্তু মল্লিকবাবুর এই শহরে মন টিকছিল না তার। এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে একদিন লখনৌ চলে গিয়েছিল সে। যাওয়ার আগে নানা আসবাবের সঙ্গে গাড়িটাও বেচে দিয়েছিল।

এবার ওটার মালকিন হয়েছিল বাঈজী মহল্লার আরেক বাসিন্দা জহুরাবাঈ। গাড়িটা যে মাসুদ জানের জানের একটা টুকরো কলিজা সেটা মোতিবাঈ জানত। তাই জহুরাকে হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, তাকে যেন ড্রাইভার হিসেবে রেখে দেয়।

বউবাজারে মোতিবাঈ যেখানে থাকত তার দু'খানা বাড়ির পর ছিল জহুরার বাড়ি। সে মাসুদ জানকে আগে থেকেই চিনত এবং তাকে শান্ত, ভদ্র, ভালমানুষ বলে জানত। মোতিবাঈয়ের অনুরোধটা রেখেছিল জহুরা।

জহুরার বয়স তখন চল্লিশের ওপরে। একসময় যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। কিন্তু পরে সারা শরীরে প্রচুর চর্বি জমিয়ে চেহারাটা বেঢপ করে তুলেছে। বিপুল পরিমাণে মদ্যপানের কারণে গলার স্বরটা হয়ে গিয়েছিল খসখসে। সে দারুণ বদমেজাজি ধরনের মেয়েমানুষ। পান থেকে চুন খসলে সবাইকে ধমকে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। চাকর-বাকর, রাঁধুনি থেকে শুরু করে যে তবলচি বা সারেঙ্গিওলা তার গানের সঙ্গে সঙ্গত করত, সবাই সর্বক্ষণ তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত।

সুরুচি বলতে কিছুই ছিল না জহুরার। কীভাবে সাজলে তাকে সেই বয়সে ভাল দেখায় এ ব্যাপারটা তার মাথাতেই থাকত না। নানা কারুকাজ-করা ক্যাটকেটে, চড়া রঙের সিল্কের সালোয়ার-কামিজ পরে, সোনার বুটি বসানো দোপাট্টা দিয়ে বুক আর কাঁধ ঢেকে রাখত। সারা গায়ে তার থাকত গাদা গাদা ভারী গয়না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সে যেন দামী দামী জেবরের দোকান সাজিয়ে রাখত।

তবে এটা মানতেই হবে, মোতিবাঈয়ের চেয়ে এতটুকু খারাপ গাইত না জহুরা। বরং তার খসখসে গলায়, বিশেষ করে গজলটা যেন আরও বেশি করে খুলত।' শুনলে মনে হত, বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠছে।

ব্রাউন সাহেব আর মোতিবাঈয়ের আমলে মাসুদ জানকে গাড়ি চালাতে হত রাত্তিরে। জহুরার কাছে এসে তার ডিউটির সময়টা বদলে গিয়েছিল। তখন দুনিয়া জুড়ে তুমুল লড়াই চলছে। পুরোদমে তার ধাক্কা এসে লেগেছে কলকাতাতেও। আমেরিকান টমিতে সারা শহর বোঝাই। রাস্তায় রাস্তায় সারাক্ষণ মিলিটারি ট্রাক গাঁক গাঁক করে ছুটছে। প্রতিটি পার্কে আত্মরক্ষার জন্য ট্রেঞ্চ আর বড় বড় বাড়ির সামনে উঁচু উঁচু ব্যাফল ওয়াল। শহরটাকে ঘিরে কত যে আর্মি ব্যারাক তার লেখাজোখা নেই। সন্ধের পর রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব ব্যাপার। প্রথম তখন ব্ল্যাক-আউট চলছে, কর্পোরেশনের আলোগুলোর গায়ে ঠুলি লাগান হয়েছে। সেই তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সালে কলকাতা যেন এক ভুতুড়ে শহর। তাছাড়া টমিরা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ মদ গিলে সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলত। রাস্তায় মেয়েটেয়ে দেখলে, তা সে যে বয়সেরই হোক না, ট্রাক বা জিপে জোর করে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত। ফলে ভয়ে কোনও মেয়ে সন্ধের পর পারতপক্ষে বাইরে বেরুত না।

তাই হাওয়া খাওয়ার সময়টা পালটে নিয়েছিল জহুরাবাঈ। চেহারাটা যতই চর্বির ঢিবি হয়ে যাক না, তারও একজন বাবু ছিল। সব ডেকচিরই তো ঢাকনা থাকে। এই বাবুটি মারোয়াড়ি। যুদ্ধের বাজারে মিলিটারিকে নানারকম মাল সাপ্লাই দিয়ে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে। তার নাম লচ্ছিন্দর ঝুনঝুনওলা। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। জহুরা যদি চর্বির ঢিবি হয়, লচ্ছিন্দর হল মেদের আস্ত একটি পাহাড়।

অঢেল পয়সা হলে যা হয়, একটি নামজাদা রক্ষিতা বা খানদানী বাঈজী না পুষলে জাতে ওঠা যায় ন। তাই দালাল লাগিয়ে বউবাজারের গলিতে জহুরাকে খুঁজে বার করেছিল সে। ব্রাউন সাহেব ছিলেন পয়লা নম্বরের লম্পট কিন্তু লুচ্চামিতে লচ্ছিন্দর তাঁর নাক এবং কান কেটে নিতে পারত। লোকটা মদ মাংস ডিম বা মাছ কিছুই খেত না। একেবারে ঘোর নিরামিষাশী। তাছাড়া পান বিড়ি সিগারেটও ছিল তার কাছে অস্পৃশ্য। যার মধ্যে আমিষ বা নেশার জিনিস এক রত্তিও ঢোকেনি, তেমন একটা পবিত্র শরীর নিয়ে যখন সে বাঈজীপাড়ায় আসত তখন লচ্ছিন্দর একেবারে আলাদা মানুষ। ভরদুপুরে জহুরাকে গাড়িতে তুলে বেরিয়ে পড়ত। যে যে দিকে মিলিটারিদের চলাচল কম, মাসুদ জানকে হুকুম দিতে সেই সেই সব জায়গায় নিয়ে যেত। সামনের দিকে চোখ রেখেও টের পেত ব্যাক সিটে বসে দু'হাতে মাঝবয়সী জহুরার শরীরটা সমানে খোবলাচ্ছে লচ্ছিন্দর। তাছাড়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেসব

আওয়াজ ভেসে আসত তাতে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকত মাসুদ জানের।

ব্রাউন সাহেব মেয়েমানুষ নিয়ে যা করত সবই রাতের অন্ধকারে। কিন্তু লচ্ছিন্দর প্রকাশ্য দিবালোকে লুচ্চামির চূড়ান্ত করে ছাড়ত। লোকটা কথা বলত খুব কম। তার-দুই হাত আর শরীরই যা করার করত। সারা দুপুর ফুর্তি লুটে বিকেলে তাকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিতে হত। সেখানে জামাকাপড়-সুদ্ধু গোটাকতক ডুব দিয়ে, গা থেকে সব পাপ মুছে, নিজেকে আগাগোড়া শুদ্ধ করে ফিরে যেত তার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। পরের দিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন, নিয়মিত রোজই এক ঘটনা ঘটে যেত।

বছর ছয় সাতেক জহুরাবাঈয়ের কাছে ছিল মাসুদ জান। তারপর বাঈজী সম্পর্কে অরুচি ধরে গেল লচ্ছিন্দরের। এতকাল আমোদ-ফর্তি করে ইহকালের সেবা করেছে, এবার পরকালের দিকে নজর দিল সে। ব্যবসা-ট্যবসার ফাঁকে সময় পেলেই হরিদ্বার, দ্বারকা, পুরী কি রামেশ্বরে নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে ছুটত। উত্তরকাশীতে এক বড় যোগীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিল। বছরে বার চারেক তার কাছে না গেলেই নয়।

এদিকে দেশে আজাদি এসে গেছে। জহুরাবাঈয়ের বয়সও হয়ে গিয়েছিল যথেষ্ট। লচ্ছিন্দর ধর্মকর্মে মন দেওয়ার পর রোজগার বন্ধ হল তার। পঞ্চাশ বছরের বাঈজী যার চুল আধাআধি পেকে গেছে, শরীরে যৌবনের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই, এই বয়সে তাকে কে পুষবে? ফলে খরচ কমানো দরকার। জমানো যে টাকা ক'টা আছে তাই দিয়ে বাকি জীবনটা তো কাটাতে হবে।

জহুরা তার গাড়িটা একটা যুবতী বাঈজীর কাছে বেচে দিল এই শর্তে, মাসুদ জানকে ড্রাইভার হিসেবে রাখতে হবে। শর্তটা অবশ্য আগের দু'বারের মতো তার আর্জিতেই করা হয়েছিল।

মাসুদ জানের তিন নম্বর মালকিন হল চামেলি বাঈ। তার পয়সার লালচ ছিল মারাত্মক। একটা নয়, দু দু'টো বাবু ছিল তার। এটা কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নয়। দুই বাবুকেই সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল; একজনের টাকায় তার পোষাবে না। যদি এতে কারও আপত্তি থাকে অন্য বাঈজীর কাছে যেতে পারে। চামেলি বাঈয়ের একনিষ্ঠতা নিয়ে ওদের শুচিবাই ছিল না। দু'জনেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

চামেলি বাঈয়ের এক বাবু আসত দুপুরের দিকে। খানিকটা সময় বাড়ির ভেতর কাটিয়ে তাকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ত সে। বিকেল পর্যন্ত বেড়িয়ে সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে আসত। সন্ধের পর আসত তার

দু'নম্বর বাবু। দু-চারটে গান শুনে সে-ও মাসুদ জানের গাড়িতে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত প্রায় একটানা গাড়ি চালিয়ে এককে দিন প্রাণ একেবারে লবেজান হয়ে যেত তার।

তবে একটা কথা মানতেই হবে, যে সব বাঈজীর কাছে সে কাজ করেছে তাদের দিল ছিল দরাজ, হাত ছিল মুক্ত। জহুরা বাঈয়ের কাছে যে তলব সে পেত তা দ্বিগুণ করে দিয়েছিল চামেলি।

চামেলিবাঈয়ের কাছে নৌকরি করার সময় তার বিবি আর বাচ্চারা মারা যায়। পর পর এতগুলো শোকে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। যতদিন সে চাকরি করেছে সেই একবারই আপনজনদের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে মাস দেড়েকের ছুটি নিয়েছিল। তারপর সামলে উঠে ফের গাড়ি চালানো শুরু করে।

চামেলি বাঈদের কাছেও বেশিদিন থাকা হয়নি। বড় জোর বছর তিনেক। তার দুই বাবুর কারোরই বড় বড় ঢাউস হেডলাইটওলা, বিউগল শেপের হর্ন-লাগানো আদ্যিকালের মোটর আদৌ পছন্দ নয়। ততদিনে নতুন নতুন মডেলের ঝকঝকে সব গাড়ি বাজারে এসে গেছে। তেমন গাড়িতে চড়ার শখ চামেলিবাঈয়েরও। সে ঠিক করে ফেলেছিল, পুরনো মোটরটা বেচে দেবে। দু-চারজন খদ্দেরের আনাগোনাও শুরু হয়েছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল গাড়িটাই শুধু কিনবে, ড্রাইভারের দরকার নেই। চালাবার লোক ওদের আছে। মাসুদ জান ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুরু থেকেই গাড়িটা চালিয়ে আসছে সে; এটার ওপর মায়া পড়ে যাওয়া ছাড়াও হঠাৎ অন্যের হাতে ওটা চলে গেলে চাকরির জন্য এই বয়সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? ব্রাউন সাহেবকে বাদ দিলে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়ি আর বউবাজারের বাঈজীপাড়ার বাইরে আর কাউকেই সে চিনত না।

ঘোর উৎকণ্ঠায় যখন দিন কাটছে সেইসময় চামেলি বাঈয়ের কাছে গিয়ে সেলাম করে খুবই বিনীতভাবে মাসুদ জান বলেছে, 'মালকিন, আমার একটা কথা আছে।'

চামেলি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী কথা?'

'গাড়িটা তো আপনি বেচে দিচ্ছেন। আমাকে যদি দেন—'

'তুমি কিনবে?'

'জি—'

রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল চামেলিবাঈ। জানতে চেয়েছে, 'কিনবে যে, দাম দেবে কী করে?'

মাসুদ জান জানিয়েছিল, এতদিন নানা জনের কাছে নৌকরি করে যে তলব পেয়েছে তার থেকে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে চার হাজার টাকা জমিয়েছে। কিছু ঘড়ি আংটি বখশিসও পেয়েছিল। তাছাড়া মৃত বিবির জেবরও আছে। সেসব বেচে দিলে আরও দু-আড়াই হাজার পাওয়া যাবে।

সমস্ত শুনে চামেলি বাঈ বলেছে, 'মতলব, তুমি ছ' সাড়ে ছ'হাজার দিতে পার।'

'জি—'

'পুরা টাকাটা দিলে তোমার হাতে তো কিছুই থাকবে না।'

এ কথার কী আর উত্তর দেবে মাসুদ জান? সে চুপ করে থেকেছে।

একটু চিন্তা করে চামেলি বাঈ এবার বলেছে, 'একজন গাড়িটার দাম দিতে চেয়েছে সাত হাজার, একজন সাড়ে সাত হাজার। আমি জানি ওটার ওপর তোমার মায়া পড়ে গেছে। তুমি আমাকে তিন হাজারই দিও।'

কৃতজ্ঞতায়, খুশিতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। যে আওরত গলার স্বর আর শরীর বেচে পয়সা কামায় তার ভেতর এত বড় একটা দিল যে থাকতে পারে তা কোনওদিন ভাবতে পারেনি। একসময় মাসুদ জান টের পায় তার দু চোখে জলে ভরে গেছে। কপালে আদাবের ভঙ্গিতে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, 'মালকিন, আপনার মেহেরবানি সারা জিন্দগীতে ভুলব না। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'তিন হাজারে দিলে আপনার বহুত নুকসান হয়ে যাবে। আমি আপনাকে চার হাজার দেব। জেবরগুলো আমার বিবির ইয়াদগার। আপনার মেহেরবানিতে ওগুলো আমার কাছে থেকে যাবে।'

চামেলিবাঈ হেসে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।'

'আপনার যদি কখনও এই গাড়িটা চড়তে ইচ্ছে হয়, হুকুম করবেন। আমি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে যাব।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। তেমন মর্জি যদি সত্যিই হয়, তোমাকে খবর দেব।'

'আদাব—'

'আদাব।'

চামেলিবাঈয়ের করুণায় গাড়িটার মালিকানা শেষ পর্যন্ত তারই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পুরনো মোটর চড়ার লোক তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। বউবাজারের আধবুড়ো বাঈজীরা মাঝে মাঝে তার গাড়িটা ভাড়া করে তাদের

বাবুদের নিয়ে চড়েছে। মাঝেমধ্যে শখ হলে ছুকরি বাঈজীরাও তাকে ডেকে পাঠাত। সব মিলিয়ে মাসে তিরিশ চল্লিশ দিনের মতো ভাড়া খাটত গাড়িটা। একা মানুষের পক্ষে তাতেই ভালভাবে চলে যেত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ওটার চাহিদা ক্রমশ কমে আসছিল।

গাড়িটা মাসুদ জানের দিলের বা জানের টুকরা হতে পারে, কিন্তু শুরু থেকে দুশ্চরিত্র শরাবী লুচ্চা আর বেশ্যা-বাঈজী ছাড়া ওটায় একবার উঠেছিল তিন ডাকু। ডাকাতি করে পালানোর সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে তার গাড়িতে জোর করে উঠে পড়েছিল তারা এবং গলায় ছোরা ঠেকিয়ে বরানগরের ওধারে একটা গলির মুখে ওদের ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল। এই নিয়ে পুলিশের হুজ্জুত মাসুদ জানের ওপর দিয়ে কম যায়নি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তার জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল।

যে সব বাঈজী তার গাড়ি চড়েছে তাদের মধ্যে মোতিবাঈ আর জহুরাবাঈ ছিল সত্যিকারের কলাকার। পয়সার জন্য শরীর বেচলেও গান ছিল তাদের পয়লা পেয়ার। রোজ ভোরে উঠে তবলচি আর সারেঙ্গিওলাদের নিয়ে ঘণ্টা তিন চারেক রেওয়াজ করত। তাদের যারা বাবু ছিল তারা গানবাজনার সমঝদার। কিন্তু পরে যে বাঈজীরা তার গাড়ির সওয়ার হয়েছে তারা স্রেফ ভাদ্রমাসের কুত্তী। তারা বাঈজী হওয়ার মতো কাবিল নয়। শরীর ছাড়া ওরা আর কিছু বুঝত না। ওদের চাই টাকা, অঢেল অপর্যাপ্ত টাকা। আর সেটা স্রেফ শরীর ভাঙিয়ে। গানের চর্চা যে তারা করত না তা নয়। সেসব সস্তা চটকদার সিনেমার গান। কালোয়াতি বা ওস্তাদি গানের ধারে কাছে তারা ঘেঁষত না।

মাসুদ জানের চাপা একটা আপসোস আছে। গাড়িটা তার জানের টুকরা হলে ওটায় কোনও ভাল, সৎ, পবিত্র মানুষ কখনও চড়েনি।

এই যে জীবনের সত্তরটা বছর কাটিয়ে চুলদাড়ি যখন ধবধবে সাদা আর ঢিলে চামড়ায় লক্ষকোটি ভাঁজ, কলকাতা ছেড়ে সে কামতাপুরে চলেছে, সেখানেও তার গাড়িতে চড়বে রঘুবন্ত সিংয়ের রক্ষিতা চম্পা। তার নসিবই এই; সৎ ভালমানুষকে এ জীবনে সওয়ার হিসেবে আর পাওয়া গেল না।

•

সময়ের উজান টানে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল মাসুদ জান। হঠাৎ তার খেয়াল হল, কলকাতা থেকে অনেক দূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে চলে এসেছে।

পার্ক সার্কাস থেকে যখন সে বেরিয়েছিল গোটা শহর সারা গায়ে হেমন্তের

ঘন কুয়াশা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। এখন কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। সূর্য সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে।

হাইওয়ের দু'ধারে আদিগন্ত ফসলের খেত। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত পাকা ধানের সোনালি লাবণ্যে ছেয়ে আছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফসল কাটা শুরু হয়ে যাবে।

ধানবনে ঢেউ তুলে উলটো পালটা বয়ে যাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সমস্ত চরাচর জুড়ে নুয়ে-পড়া পাক ধানের আওয়াজ উঠছে—ঝুন ঝুন। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিনদেশি টিয়া। ধান পাকার খবর পেয়ে তারা দিগন্ত পাড়ি দিয়ে এখানে চলে এসেছে।

এই ভরদুপুরেও রোদের তাত তেমন নয়। উত্তুরে বাতাসে যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজটুকু এখনও রয়েছে তা বড়ই আরামের।

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে এসে একবার চারপাশে তাকায় মাসুদ জান। লম্বা হাইওয়েটা মোটামুটি ফাঁকাই। মাঝে মাঝে উলটো দিক থেকে গাঁক গাঁক করে লরির কনভয় পাশ দিয়ে কলকাতার দিকে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভোরে নিজের হাতে চা বানিয়ে খেয়েছিল; সেই সঙ্গে দু'খানা বাসি রুটি। তাছাড়া এতটা বেলা পর্যন্ত পেটে আর কিছু পড়েনি।

হাইওয়ের ধারে ধারে পাঞ্জাবিদের যে অনেক ধাবা আছে, মাসুদ জান তা জানে। আরও ঘন্টাখানেক পর একটা ধাবা পাওয়া গেল। সেখানে গাড়ি থামিয়ে, হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে, পেট ভরে রুটি-তড়কা আর বড় এক গেলাস লস্যি খেয়ে আবার চলার শুরু।

বিকেলের কিছু আগে আগেই পশ্চিমবাংলার বর্ডার পেরিয়ে বিহারে পৌঁছে গেল গাড়িটা। কীভাবে, কোন রাস্তা ধরে বর্ডার থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কামতাপুরে যাওয়া যাবে তার পরিষ্কার একটা ছক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রঘুবন্ত সিং। সেইমতো হাইওয়ে থেকে ডানদিকের পথটা ধরল মাসুদ জান।

মাইল তিরিশেক চলার পর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের অনেকটা পাড়ি দিয়ে দিগন্ত ছুঁতে চলেছে; রোদের রং যখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে সেই সময় দেখা গেল ডানদিকের মাঠ ভেঙে দুটো লোক মাথার ওপর হাত তুলে নাড়তে নাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। তারা সমানে চিৎকার করছিল, 'মোটর রুখিয়ে, মোটর রুখিয়ে—'

প্রথমটা ভীষণ চমকে উঠেছিল মাসুদ জান। এখানে চারিদিক সুনসান। পশ্চিম

বাংলার মতো হাইওয়ের ফ্যাকড়া এই রাস্তাটার দু'ধারে পাকা ধানের খেত। অনেক দূরে দূরে আবছা দু-একটা গাঁ। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। তবে প্রচুর পাখি উড়ছে আকাশ জুড়ে। এর মধ্যে ওই লোকদুটো মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে যে বেরিয়ে এল, কে জানে। ওদের কোনওরকম বদ মতলব আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

একটু দুশ্চিন্তা যেমন হচ্ছিল, তেমনি তার পাশাপাশি কিছুটা কৌতূহলও বোধ করছিল মাসুদ জান। শেষ পর্যন্ত ভাবল, দেখাই যাক না, লোকদুটো তার কাছে কী চায়। গাড়ির গতি খানিকটা কমিয়ে দিল সে। তেমন বুঝলে ফের স্পিড বাড়িয়ে দেবে।

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকদুটো ধানখেত পেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িটার পাশে চলে আসে। কাছাকাছি আসতে দেখা যায় দু'জনেই দেহাতি মানুষ, বয়স ষাটের ওপরে। একজনের পরনে খাটো ধুতি আর হাফ-হাতা জামা। আরেক জনের ধুতির ওপর মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। সারা গা রক্তে মাখামাখি। একজনের মাথা ফেটে অনেকটা জায়গা হাঁ হয়ে আছে। আরেক জনের কপাল ঢিবির মত ফুলে রয়েছে আর থুতনির মাংস ডেলা পাকিয়ে ঝুলে পড়েছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। শুধু মুখ এবং মাথাই নয়, ভাল করে লক্ষ করতে মাসুদ জানের চোখে পড়ল, তাদের হাতে, পায়ের গোছে এবং কাঁধে অগুনতি চোটের দাগ। দু'জনেরই চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন। বোঝা যায়, লাঠি বা অন্য কোনও ভারী ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে লোকদুটোকে এলোপাথাড়ি পেটানো হয়েছে।

এই বয়সের দুটো মানুষকে এমন মারাত্মকভাবে কেউ মারতে পারে, তা যেন ভাবা যায় না। অসীম উৎকণ্ঠায় মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমাদের? এভাবে জখম হলে কী করে?'

দুটো লোকের মধ্যে একজন বেশ ঢ্যাঙা আর রোগা। আরেক জনের গোলগাল, ভারী চেহারা। ঢ্যাঙা লোকটা হাতজোড় করে বলে, 'মিঞা সাব, আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না। চারগো বদনসিব লড়কীকো কিরপা করকে বঁচাইয়ে।'

এবার গাড়িটা পুরোপুরি থামিয়ে দেয় মাসুদ জান। রক্তাক্ত, ভয়ঙ্করভাবে জখম লোকদুটো নিজেদের কথা বলছে না ; চারটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুলভাবে শুধু আর্জি জানাচ্ছে। জীবনে ওদের এই প্রথম দেখল সে। ওরা কোথায় থাকে, কী করে, পরিচয়ই বা কী, কিছুই জানা নেই। তার ওপর যে

চারটে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছে তাদের তো চোখেই দেখেনি।

মাসুদ জান বিমূঢ়ের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে যায়, 'যে লেড়কীদের কথা বলছ তারা কারা? ওদের বাঁচাতে হবে কেন? কোনও বিপদে পড়েছে কী?'

'হাঁ, বহুৎ ভারী খতরা। আমাদের সঙ্গে এখনই চলুন। নইলে ভূচ্চরের ছৌয়া জগনলাল ওদের তুলে নিয়ে যাবে।' তুলনায় খাটো চোহারার লোকটা মাসুদ জানের একটা হাত চেপে ধরে।

প্রথমে অচেনা দুটো লোক, তারপর অদেখা চারটে মেয়ে, এখন তার ওপর কে এক ভূচ্চরের বাচ্চা জগনলাল এসে গেল! মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যায় মাসুদ জানের। সে বলে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লোকদুটো শ্বাসরুদ্ধ মতো একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আমাদের গাঁওয়ে চলুন। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। চলিয়ে, তুরন্ত চলিয়ে—'

লোকদুটোর তীব্র আকুলতা মাসুদ জানকে ভেতরে ভেতরে এবার নাড়া দিয়ে যায়। তার ওপর কৌতূহলটা তো ছিলই। লোকদুটোর কথা থেকে যেটুকু আঁচ পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি আছে। তবু অদৃশ্য কেউ যেন জানিয়ে দিল, এই বয়স্ক গাঁওবালা দুটোর সঙ্গে যাওয়াটা খুবই জরুরী। মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের গাঁও কোথায়?'

ঢ্যাঙা লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধানখেত যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'উহাঁ—'

অবাক হয়ে মাসুদ জান বলে, 'এই ধান জমিনের ওপর দিয়ে ওখানে যাব কী করে?'

ঢ্যাঙা লোকটা এবার জানায় রাস্তাটা ধরে সামনের দিকে খানিকটা গেলে ডান ধারে একটা কাঁচা মেঠো পথ; এ অঞ্চলে যাকে বলে 'কাচ্চী'—রয়েছে। ওটা দিয়ে মোটরে করে তাদের গাঁয়ে পৌঁছুতে দশ মিনিটও লাগবে না।

'লেকেন—'

'কী?'

'তোমাদের যা হাল, যেভাবে খুন ঝরছে তাতে এখনই হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

'আমাদের কথা পরে ভাবব, আগে লেড়কী চারটে তো বাঁচুক।'

এত করে বলা সত্ত্বেও মাসুদ জানের সংশয়টা যে পুরোপুরি কেটেছে তা বলা যায় না। তবু একটু দ্বিধান্বিতভাবে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমার গাড়িতে উঠে পথ 'দেখিয়ে নিয়ে চল।' বলে পেছন দিকের দরজাটা খুলে দেয়।

লোকদুটো খানিক ইতস্তত করে বলে, 'আমাদের খুন লেগে যাবে আপনার গাড়িতে—'

'তোমরাই তো বললে লেড়কীগুলোকে বাঁচাতে হবে। লাগুক খুন, উঠে পড়।'

লোকদুটো বুঝিবা আগে কখনও মোটরে চড়েনি। তারা উঠে ব্যাক সিটে জড়সড় হয়ে বসে থাকে। মাসুদ জান গাড়িতে ফের স্টার্ট দেয়। অজানা এক গ্রামের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করে করে লোকদুটোর কাছ থেকে যা জানা যায় তা এইরকম। যে মাথায় বেশি লম্বা তার নাম ধনপত, অন্যজন হল গণেরি। তাদের গাঁয়ের নাম মনচনিয়া। পাশাপাশি তাদের বাড়ি। দু'জনেরই কয়েক বিঘা করে জমিজমা আছে। সেখান থেকে বছরে দু'বার যে ফসল ওঠে তাতে মোটামুটি চলে যায়। বংশ পরম্পরায় ধনপত আর গণেরি চাষবাস নিয়েই আছে। তারা লেখাপড়া জানে না, বিলকুল আনপড়।

ধনপতের দুই মেয়ে, দু'টিরই বিয়ে হয়ে গেছে। এক মেয়ে থাকে ঝরিয়ায়, অন্যটি হাজারিবাগে। গণেরির একটাই ছেলে। শখ করে তাকে তিন মাইল দূরের স্কুলে পাঠিয়েছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর সে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে, জমি চষার মতো ছোট কাজ আর করবে না। আজকাল পিছড়ে বর্গের অর্থাৎ পিছিয়ে-থাকা মানুষদের জন্য অনেক চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা আছে। সরকারী বিজলি কোম্পানিতে একটা কাজ জুটিয়ে সে বৈশালী চলে গেছে। সেখানে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছে, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। গণেরির ঘরবালী মারা গেছে বছর সাতেক আগে। দুনিয়ায় সে একেবারে একা। ধনপতের ঘরবালী অবশ্য এখনও জীবিত; তবে বাত এবং অন্য সব রোগে একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছে।

আজন্ম তারা পড়শিই শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। সারাদিন দু'জনে নিজেদের জমিতে বা বাড়িতে কাজ করে। সন্ধের পর গাঁয়ের পণ্ডিত এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঝমনলাল ঝা'র বাড়িতে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠের যে জমায়েত হয় সেখানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত পাঠ শোনে। মোটামুটি এই হল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের তালিকা। এর মধ্যে বড় রকমের কোনও চমক বা চোখধাঁধানো ঘটনার সুযোগ নেই। বছরের পর বছর এইভাবে, খুবই ঢিমে তালে সময় কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু আজ সকালে যা ঘটল, তাদের ষাট-বাষট্টি বছরের জীবনে কোনওদিন ওরা তা চিন্তাও করতে পারেনি। ব্যাপারটা যতটা চমকদার, তার চেয়ে অনেক

বেশি ভয়ঙ্কর।

তাদের গাঁ থেকে তিন-চার মাইল দূরে বড় একটা গঞ্জ রয়েছে; নাম ভোগবানি। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বরখা নদী। গঞ্জটাকে ঘিরে মাঝারি মাপের জমজমাট একটা টাউন গড়ে উঠেছে। ভোগবানির একধারে প্রচুর বাড়িঘর নিয়ে শহর; আরেক দিকে নদীর পাড় ঘেঁষে ধান চাল গেঁহুর সারি সারি আড়ত। এখানেই অনেকটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে সপ্তাহে একদিন বিরাট হাট বসে। চলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা।

ফি হাটবারেই ধনপত আর গণেরি ভোগবানিতে কেনাকাটা করতে যায়। আজও ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ওরা যখন হাটের কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় রোদ উঠে গেছে। তবে তখনও তেমন লোকজন আসেনি; সেভাবে বিকিকিনিও শুরু হয়নি।

হাটের মূল জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা বহুকালের পুরনো গুদাম টুটোফাটা চাল মাথায় নিয়ে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। এককালে ওটা ছিল এক মারোয়াড়ীর। সে মারা গেলে বহুকাল ফাঁকা পড়ে থাকার পর কিছুদিন হল জগনলাল ওটার দখল নিয়ে নেয়।

জগনলাল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দুকবাজ। তার অনেক সাকরেদ। এরা মোটা টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। চুনাওয়ের সময় নেতাদের হয়ে ভোটের কাজও করে। ওদের দাপটে তিরিশ-চল্লিশ মাইলের ভেতর যত লোকজন রয়েছে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। পুলিশের সঙ্গে, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে জগনলালের ওঠাবসা।

মনচনিয়া গাঁ থেকে হাটে ঢুকতে হলে ওই ফাঁকা গুদামটার পাশ দিয়ে যেতে হয়। ধনপতরা যখন ওটার সামনে এসে পড়েছে সেই সময় হঠাৎ ভেতর থেকে অনেকগুলো মেয়ের কান্না আর চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'বাঁচাও—বাঁচাও—'

পড়ো গুদামটার পাশ দিয়ে আগে বহুবার হাটে গেছে ধনপতরা ; জগনলাল আর তার সাকরেদদের বারকয়েক ওখানে দেখেছেও কিন্তু আগে কখনও কোনও মেয়ে চোখে পড়েনি বা তাদের গলাও শোনা যায়নি। দু'জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মেয়েগুলো একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'কে আছ, আমাদের এখান থেকে বার করে নিয়ে যাও। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

তারা যে বাঙালি সেটা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। বাংলা ভাষাটা বলতে

না পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারে ধনপতরা। এই ফাঁকা গুদাম ঘরে কোত্থেকে বাঙালি মেয়েরা এসে জুটল ভেবে পাচ্ছিল না তারা। ওদের করুণ, আর্ত চিৎকার ধনপতদের বুকে ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। একবার ধনপতরা ভেবেছে, এ সব ঝঞ্ঝাটে, বিশেষ করে যার মধ্যে জগনলাল জড়িয়ে আছে, মাথা না গলানোই বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

চিন্তিতভাবে গণেরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করা যায় বল তো?'

ধনপত বলেছে, 'বুঝতে পারছি না।'

'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'মেয়েগুলোকে বাঁচানো দরকার।'

'লেকেন জগনলাল কীরকম খতরনাক আদমী তা তো জানো।'

কিছুক্ষণ ভেবে গণেরি বলেছে, 'দুনিয়ার সবাই তা জানে। তাই বলে মেয়েগুলোর সর্বনাশ হয়ে যাবে?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে ধনপত কিন্তু কোনও উত্তর দেয়নি। গণেরি এবার গুদামটার খুব কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে এসেছিল কিন্তু কাউকেই দেখতে পায়নি। সে বলেছে, 'মনে হচ্ছে, জগনলালের সঙ্গে যে ভূচ্চরের ছৌয়াগুলো ঘোরে তারা এখন কেউ নেই।'

ধনপত বলেছে, 'হ্যাঁ। থাকলে লেড়কীগুলো অমন করে চিল্লাতে পারত না।'

গণেরি বলেছে, 'চল। ভেতরে গিয়ে একবার দেখি।'

ধনপতের সাহস হচ্ছিল না। ভয়ে ভয়ে সে বলেছে, 'লেকেন—'

'কী?'

'জগনলাল টের পেলে—'

ধনপতকে থামিয়ে দিয়ে গণেরি এবার বলেছে, 'এসো তো—'আসলে মেয়েগুলোর কাতর লাগাতার চিৎকার তাদের খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। তা ছাড়া ধনপতের তুলনায় সে অনেক বেশি সাহসী।

গুদামটার সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। অনেক কাল লোকজনের যাতায়াত ছিল না বলে প্রচুর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। অবশ্য কিছু গাছপালা ঝোপঝাড় ছেঁটে সরু পায়ে চলার পথ তৈরি করা হয়েছে। ওটা যে জগনলালদের কাজ সেটা বোঝা যায়।

আগাছার ঝোপ পেরুলে টিনের চালের বিশাল গুদামটার সামনের দিকে লোহার গুল-বসানো প্রকাণ্ড দরজা। পুরনো হলেও এখনও বেশ মজবুত।

দরজাটার বাইরে একটা মোটা শেকল তুলে রাখা ছিল। ধনপতদের মনে হয়েছিল, কেউ বেরিয়ে গিয়ে ওভাবে গুদামটা বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে ভেতরকার মেয়েগুলো বেরুতে না পারে। যে-ই শেকল তুলে দিক সে যে কাছেই কোথাও গেছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কেননা বেশিদূর গেলে নিশ্চয়ই তালা দিয়ে যেত।

শেকল খুলতেই ভেতরকার কান্নাকাটি এবং চিৎকার মুহূর্তে থেমে যায়।

বাইরে থেকে গণেরি বলে, 'চুপ করে গেলে কেন? কে আছ, বেরিয়ে এসো—'

তবু সাড়াশব্দ নেই।

এবার দু'জনে ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারটে মেয়ে—ষোল থেকে কুড়ির ভেতর বয়স—হুড়মুড় করে তাদের পায়ের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। ওদের চোখেমুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ। মনে হয়, বেশ কয়েকদিন তারা খায়নি, ঘুমোয়নি। গণেরি বলে, 'এতক্ষণ ধরে তোমাদের ডাকাডাকি করছি, জবাব দিচ্ছিলে না কেন?'

মেয়েগুলোর মধ্যে যে বয়সে সবার বড় সে রুদ্ধস্বরে বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম ওই লোকটা ফিরে এসেছে।'

'কোন লোকটা?'

'ওই বড় বড় মোচওলা—আমাদের যে পাহারা দিচ্ছিল—'

'সে কোথায় গেছে?'

'হাটে কেনাকাটা করতে—'

'তোমরা এখানে এলে কী করে?'

মেয়েটা বলেছে, 'আমাদের আগে বার করে দূরে কোথাও নিয়ে চলুন। লোকটা এসে পড়লে কেউ বাঁচব না। আপনাদেরও ভীষণ বিপদ হবে।'

তখন ভাল করে সব দিক ভাবার মতো সময় ছিল না। গণেরি এবং ধনপত একসঙ্গে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়, চল আমাদের সঙ্গে—'

কিন্তু বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি, গুদামের সামনের আগাছা-ভরা জায়গাটা পেরুবার আগেই পাকানো গোঁফওলা লোকটা ফিরে এসেছিল। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের ব্যাগ-বোঝাই জিনিসপত্র। হয়তো খাবার দাবারই হবে।

তার চেহারা পাক্কা দুশমনের মতো। বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। জোড়া ভুরু, ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হিংস্র চোখদুটো দেখলে টের পাওয়া যায় খুনখারাপি করাটা এর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। পরনে ছিল চাপা ফুলপ্যান্টের ওপর

হাফ-হাতা, মোটা গেঞ্জি।

গণেরি আর ধনপত লোকটাকে দেখেই মেয়েগুলোকে বলেছিল, 'দৌড় লাগাও—'

চারটে মেয়ে আর ধনপতরা দু'জন, ছ'জনে উর্ধ্বশ্বাসে আগাছার জঙ্গল ভেঙে ছুটতে শুরু করেছিল। লোকটা ততক্ষণে তাদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে। চোখের পলকে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে, একটা লাঠি জুটিয়ে নিয়ে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে তাড়া করে এসেছিল।

গণেরি আর ধনপতের মতো ষাট-বাষট্টি বছরের দুই বুড়ো এবং যুবতী চারটে মেয়ের পক্ষে কত জোরে দৌড়নো সম্ভব? গুদামের চৌহদ্দি ছাড়ালে রাস্তা, পরপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ন্যাড়া মাঠ। মাঠটা পেরুলে ধানখেত। ধানখেতে পড়ার আগেই তাদের ধরে ফেলেছিল লোকটা। সে বুঝতে পেরেছিল, ধনপত আর গণেরি মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল সে। ধনপতরা খুনই হয়ে যেত কিন্তু গণেরি পায়ের কাছে একটা ভারী পাথরের টুকরো পেয়ে যায়। সেটা তুলে নিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে অন্ধের মতো ছুঁড়ে মারে। সেটা সোজা গিয়ে লাগে লোকটার মুখে। তীব্র গোঙানির মতো আওয়াজ করে ঘাড় গুঁজে সে মাঠের ওপর পড়ে যায়। তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কে জানে।

এরপর মেয়ে চারটেকে নিজেদের গাঁয়ে নিয়ে আসে ধনপতেরা। পথেই জেনে নিয়েছিল, ওদের বাড়ি বাংলা মুল্লুকে। একজনের মুর্শিদাবাদে, একজনের হুগলিতে, তৃতীয় আর চতুর্থ জনের বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে। আগে কেউ কাউকে চিনত না। খুব গরীব ঘরের মেয়ে তারা। নৌকরি দেবার নাম করে বদ লোকেরা তাদের কলকাতায় নিয়ে আসে। সেখানে জগনলালের কাছে ওদের বেচে দেওয়া হয়। জগনলাল একটা মোটরে করে পরশু মেয়েগুলোকে ভোগবানিতে এনে ওই গুদামটায় তুলেছে। দুশমনের মতো চোহারার লোকটার পাহারায় ওদের রেখে সে গেছে পাটনায়। মেয়েরা শুনেছে, তাদের নাকি বোম্বাইতে কার কাছে বেচে দেওয়া হবে। সেই খদ্দেরকে সঙ্গে করে দু-একদিনের মধ্যে জগনলাল পাটনা থেকে ফিরে আসবে।

গণেরি আর ধনপত শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল। জগনলাল এতকাল বন্দুকবাজি করে বেড়িয়েছে। সে যে আওরতের ব্যবসায় নেমেছে, কে ভাবতে পেরেছিল!

মেয়েগুলোকে মনচনিয়ায় এনে ধনপতের বাড়ির একটা ঘরে রেখে ওরা বড় সড়কে চলে এসেছিল। এই রাস্তাটা দিয়ে বাংলা মুল্লুকের দিকে রোজ শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি যায়। ওদের ইচ্ছা, এমন একটা গাড়ি ধরে মেয়েগুলোকে যার যার মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বেশির ভাগ গাড়িকেই থামানো যায়নি। দু-একটা যা থেমেছে, হাজার কাকুতি মিনতিতেও তাদের রাজী করাতে পারেনি। ভগোয়ান রামচন্দ্রজির করুণায় শেষ পর্যন্ত তারা মাসুদ জানকে পেয়েছে।

কথা শেষ করে ধনপত বলে, 'এখন জরুর বুঝতে পারছেন, কেন আপনাকে জবরদস্তি আমাদের গাঁওয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিরপা করে লেড়কীগুলোকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিন। আমাদের গাঁয়ে থাকলে ওদের বাঁচাতে পারব না।'

কী করবে, মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল মাসুদ জান। একটু হেসে বলে, 'তোমরা তো আমাকে চেন না। কোন ভরসায় চারটে লেড়কীকে আমার হাতে তুলে দিতে চাইছ? আমি আচ্ছা আদমী না-ও হতে পারি।'

গণেরি বলে, 'আপনাকে দেখেই বুঝেছি—সাচ্চা আদমী। যদি খারাপ হন, বুঝব সেটা ওদের নসিব।'

যে সারাটা জীবন নষ্ট লোকদের গাড়িতে তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে কিনা ওরা ভালমানুষ ধরে নিয়েছে! এক ধরনের অপরাধবোধ কিছুক্ষণের জন্য মাসুদ জানকে বিষণ্ণ করে রাখে। পরক্ষণে ভাবে, পেটের জন্য কত কী-ই তো মানুষকে করতে হয়। সে সজ্ঞানে জীবনে কোনও অন্যায় করেনি।

মাসুদ জান টের পায়, 'সাচ্চা আদমী' শব্দ দুটো তার মধ্যে তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে চলেছে। একসময় সে বলে, 'মেয়েগুলোকে তো আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে চাইছ। জগনলাল জানতে পারলে তোমাদের মুশকিল হয়ে যাবে যে—'

গণেরি বলে, 'তা হবে। আমাদের উমর ষাট পেরিয়ে গেছে মিঞাসাব। আর ক'দিনই বা বাঁচব! দু-এক সাল আগেই না হয় একটা ভাল কাজের জন্য মরলাম।'

গাঁয়ে এসে মোটরটা থামার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতের বাড়ির কোণের দিকের ঘর থেকে চারটে মেয়েকে বার করে এনে ওরা ব্যাক সিটে তুলে দেয়। বলে, 'ভাইসাব, এক্ষুণি গাড়ি চালিয়ে দিন।'

ধনপতদের তাড়ার কারণটা বুঝতে পারছিল মাসুদ জান। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে লক্ষ করে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে গণেরি আর ধনপত। তারা বিড়বিড় করে বলে, 'ভগোয়ান আপনার ভাল করবেন।'

আপন মনে মাসুদ জান বলে, 'খোদা মেহেরবান। তাঁর দোয়ায় তোমাদেরও ভাল হবে।'

হাইওয়ের দিকে যেতে যেতে সে ভাবে, এখন তার প্রথম কাজ হল চারটে মেয়েকে তাদের মা-বাপের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একদিনে চার জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে না, কম করে দু-তিনদিন লেগে যাবে। তারপর কলকাতায় ফিরে রঘুবন্ত সিং যে টাকাটা রাহা খরচ হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা তাঁর পাটনার ঠিকানায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তার গাড়িতে ধনপত আর গণেরির মত সাচ্চা, সৎ মানুষেরা এই প্রথম উঠেছে। এরপর লুচ্চা, বেশ্যা আর বাঈজীদের কোনওদিনই সেটায় তোলা যাবে না।

জন্মদাত্রী

ধবধবে উর্দিপরা দারোয়ান গেট খুলে দিতেই লাল মারুতি ওমনিটা ভেতরে ঢুকে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে যে উঁচু পিলারওলা বিশাল তেতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তার নাম 'মুখার্জি ভিলা'। ওটার দিকে তাকানো মাত্র গোথিক স্থাপত্যের কথা মনে পড়ে যায়।

ছড়ানো কম্পাউন্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটার সামনে, পেছনে এবং দু'পাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, নুড়ির রাস্তাটা তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পেছনে গ্যারাজ, সারভেন্টস কোয়ার্টার্স ইত্যাদি। দু'পাশে লাইন দিয়ে রয়াল পাম, যেগুলোর মাথা উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই বনস্পতিগুলো 'মুখার্জি ভিলা'র অহঙ্কার। সত্তর-আশি বছর আগে তৈরি এই বাড়িটাকে কলকাতার হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

মারুতি ওমনিটা চালিয়ে এনেছিল রাহুল। দারুণ সুপুরুষ, ছ'ফিটের মতো হাইট। তার লম্বাটে মুখ, চওড়া কপাল, ব্যাকব্রাশ-করা চুল, উজ্জ্বল চোখ, টকটকে রং—সব কিছুতে এমন এক রুচি আর আভিজাত্য রয়েছে যা মুহূর্তে তার বংশ-পরিচয় জানিয়ে দেয়। খুব বনেদি, বিত্তবান পরিবারে সে জন্মেছে।

চাবি দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে ডান পাশে তাকাল রাহুল। পারমিতা দুই হাত কোলের ওপর রেখে আড়ষ্টের মতো বসে আছে।

আজ নভেম্বরের দু তারিখ। ক'দিন আগে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। শরৎকালের পর হেমন্তের শুরু থেকে কলকাতার তাপমাত্রা নামতে থাকে। এখন, এই বিকেলবেলায় বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডার আমেজ। তবু পারমিতার কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। ভেতরকার লুকনো টেনশন ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

পারমিতার মনোভাবটা বুঝতে পারছিল রাহুল। আজই প্রথম তার মা স্বর্ণলতা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নামটা যেমনই হোক, মায়ের স্বভাবে লতার মতো নমনীয়তা নেই। যা আছে তা হল রূঢ় কাঠিন্য; কখনও কখনও সেটাকে নিষ্ঠুরতা মনে হতে পারে। স্বর্ণলতা সম্পর্কে আগেই পারমিতাকে সব জানিয়ে দিয়েছে রাহুল; কোনও কিছুই গোপন করেনি। আসলে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে টালিগঞ্জে

এই মারুতি ওমনিতে পারমিতা যখন উঠল তখনও তার যে মনোবলটুকু ছিল, 'মুখার্জি ভিলা'য় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পারমিতার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু চব্বিশ-পঁচিশের বেশি দেখায় না। আশ্চর্য কোনও ম্যাজিকে বয়সটাকে সে যেন চার-পাঁচ বছর কমিয়ে রেখেছে। রং একটু চাপা হলেও তার ডিম্বাকৃতি নিটোল মুখমণ্ডল, বড় বড় দীর্ঘ চোখ, নাক, চিবুক, গ্রীবা, সতেজ স্বাস্থ্যের লাবণ্য—সব মিশিয়ে অলৌকিক একটা ব্যাপার আছে।

স্বর্ণলতা জাঁকজমক খুব পছন্দ করেন। তাই পারমিতাকে আজ তার একমাত্র দামী শাড়ি, একটা সবুজ কলাপাতা রঙের মাইশোর সিল্ক যার আঁচল আর পাড়ে দারুণ সব নকশা—পরতে হয়েছে। বিউটি পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধেছে। যে সামান্য ক'টা গয়না আছে তাও পরেছে। তাকে মায়াকাননের কোনও পরীর মতো মনে হচ্ছে।

পারমিতার কাঁধটা আলতো করে ছুঁয়ে নীচু গলায় রাহুল বলল, 'বি স্টেডি—' সে বুঝতে পারছিল তার নিজের গলাও কাঁপছে। হয়তো পারমিতার টেনশনটা তার মধ্যেও চারিয়ে গেছে।

পারমিতা চুপ করে থাকে।

রাহুল এবার গাড়ি থেকে নেমে ওধারের দরজা খুলে দিতে দিতে বলল, 'নামো—'

অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো নিঃশব্দে নেমে এল পারমিতা। গাড়িটা যেখানে থেমেছে তার পাশ থেকে শ্বেতপাথরের চওড়া চওড়া সিঁড়ি। রাহুলের পাশাপাশি সেগুলো পেরিয়ে ওপরের চাতালে উঠে এল পারমিতা। এখানে দু'ধারে মোটা মোটা থামের সারি। তার মাঝখান দিয়ে খানিকটা এগুলে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড দরজা, যার মাথার দিকটা অর্ধগোলাকার।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে পা দিতেই লাল কার্পেটে মোড়া মস্ত হল-ঘর। চার-পাঁচ সেট সোফা, সেন্টার টেবিল, ছোট ছোট টিপয় নানা জায়গায় সাজানো রয়েছে। একধারে দারুণ একটা পিয়ানোও চোখে পড়ে। সিলিং থেকে নেমে এসেছে ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে প্রচুর অয়েল পেন্টিং। আর কী কী আছে, সে সব খুঁটিয়ে দেখার মতো মনের অবস্থা নয় পারমিতার। হল-ঘরের ভেতর দিয়ে সামনের প্যাসেজের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

রাহুলও থেমে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

পারমিতা মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি ফিরে যাব।'

'তার মানে?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কীসের ভয়? তুমি কি কোনও অন্যায় করেছ?' রাহুল বোঝাতে চেষ্টা করল।

পারমিতা উত্তর দিল না।

ভেতরে ভেতরে মায়ের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ছিলই রাহুলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলে পারমিতা আরও ঘাবড়ে যাবে; তাই আগাগোড়া নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। সে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। আমরা যা ঠিক করেছি সেটাই হবে।' পারমিতার একটা হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চল—'

হল-ঘরের ডান পাশে একটা প্যাসেজ। সেটা দিয়ে খানিকটা গেলে দোতলায় ওঠার জন্য পেতলের পাত-বসানো কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি। সেখানে একটি মাঝবয়সী কাজের লোককে দেখা গেল। রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'মা কোথায় অতুলদা?'

অতুল নামের লোকটা দ্রুত একবার পারমিতাকে দেখে নিয়ে বলল, 'দোতলার হল-ঘরে আপনাদের জন্যে বসে আছেন। বড় সাহেবও আছেন।' রাহুল যে পারমিতাকে নিয়ে আসবে খুব সম্ভব সে তা জানে। হয়তো স্বর্ণলতা বলে থাকবেন, কিংবা অন্য কোনওভাবে শুনেছে।

বড় সাহেব অর্থাৎ তার বাবা জ্যোতিভূষণও অপেক্ষা করছেন জেনে ভীষণ অবাক হল রাহুল। সাংসারিক কোনও ব্যাপারেই থাকেন না তিনি। পড়াশোনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা—এ ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর। ঐতিহাসিক হিসেবে জ্যোতিভূষণের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। শুধু এদেশেরই না ; ইউরোপ, আমেরিকার নাম-করা পাবলিশাররা তাঁর অনেক বই প্রকাশ করেছে। নানা কনফারেন্স, বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পড়ানো ইত্যাদি কারণে প্রায়ই লন্ডন, সিডনি, টোরোন্টোতে ছুটতে হয় তাঁকে। রাহুলরা তিন ভাইবোন। সে সবার ছোট, দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা কে কী পড়বে, মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে— এ সব ব্যাপারে স্বর্ণলতার মতামতই শেষ কথা। রাহুলের ধারণা জ্যোতিভূষণ যে আজ দোতলায় বসে আছেন সেটা মা চেয়েছেন বলে। হয়তো পারমিতা সম্পর্কে তিনি একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না।

ওপরেও হুবহু একতলার মতোই একটা হল-ঘর। তেমনই কয়েক সেট সোফা, ঝাড়বাতি, অয়েল পেন্টিং। বাড়তির মধ্যে রয়েছে টিভি, ভি সি আর,

গোটা চারেক নানা রঙের টেলিফোন, অজস্র কিউরিও আর পেতলের অসংখ্য টবে বিচিত্র চেহারার সব অর্কিড। হল-ঘরটার তিন দিকে চার-পাঁচটা বেডরুম। নীচের তলার মতোই ডানদিকে প্যাসেজ। অর্থাৎ তেতলায় ওঠার সিঁড়িটা ওখানেই।

রাহুলের সঙ্গে দোতলায় আসতেই পারমিতার চোখে পড়ল, হল-ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝাড়বাতির তলায় দুটো আলাদা সোফায় বসে আছেন স্বর্ণলতা আর জ্যোতিভূষণ। তাঁদের কথা এতবার রাহুলের মুখে সে শুনেছে যে দেখামাত্রই চিনতে পারল।

স্বর্ণলতার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। চুলের অনেকটাই সাদা হয়ে এসেছে, ত্বকের চিকন মসৃণতাও তেমন নেই, তবু সৌন্দর্যের যে রশ্মিগুলো এখনও থেকে গেছে, চোখ ঝলসে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। তাঁর সাজসজ্জায় রয়েছে নিখুঁত বনেদিয়ানার ছাপ। ঘি-রঙের যে মূল্যবান সিল্কের শাড়িটি তিনি পরেছেন তার পাড়ে নানা রঙের সুতোর কারুকাজ। আংটি, নাকছাবি, ব্রেসলেট এবং সরু হারের পেনডান্ট—সব কিছুতেই হীরে বসানো। খুব সম্ভব বিউটি পার্লার থেকে তিনিও চুল বাঁধিয়ে এসেছেন। সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন এক অটুট গাম্ভীর্য রয়েছে যাকে দাম্ভিকতা মনে হতে পারে।

রাহুলের সঙ্গে জ্যোতিভূষণের চেহারার দারুণ মিল। ওঁরা যে বাবা এবং ছেলে, বলে দিতে হয় না। ত্রিশ-বত্রিশ বছর পর চুল পাকলে, শরীরে বেশি করে মেদ জমলে, ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হলে রাহুল তার বাবার মতোই হয়ে যাবে।

জ্যোতিভূষণের পরনে ঘরোয়া পোশাক—ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি। এই বয়সেও তাঁর চুল বেশ ঘন। চোখে পুরু ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। হঠাৎ দেখলে তাঁকে রাশভারি মনে হবে। তবে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায় মানুষটা চুপচাপ, অন্যমনস্ক ধরনের।

পারমিতাকে নিয়ে স্বর্ণলতাদের সামনে চলে এল রাহুল। মা আর বাবার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে পারমিতা।'

পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণলতা। পারমিতাকে বললেন, 'বসো—'

পারমিতা নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এমন বিশাল বাড়িতে, স্বর্ণলতাদের মতো এত অভিজাত মানুষদের কাছাকাছি আসার সুযোগ আগে আর কখনও হয়নি। অদ্ভুত এক কাঁপুনি বুকের ভেতর থেকে স্রোতের মতো নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিল যেন। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। স্বর্ণলতা বলামাত্র একটা সোফায় নিজের শরীরের ভার কোনওরকমে ছেড়ে দিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'সোনু তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আশা কবি সঠিক উত্তর পাব।'

রাহুলের ডাকনাম যে সোনু, পারমিতা তা জানে। মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ সব প্রশ্নেরই উত্তর দেবে।

আগে থেকেই বোধহয় বলা ছিল। একটা বেয়ারা নীচু গ্লাস-টপ ট্রলির ওপর নানা আকারের প্লেটে খাবার বোঝাই করে নিয়ে এল। এ সব ছাড়াও রয়েছে জলের গেলাস, ভাঁজ-করা ক'টা ন্যাপকিন, কাঁটা-চামচ এবং ফাঁকা কিছু প্লেট। মস্ত আয়তক্ষেত্রের মতো সেন্টার টেবলটায় সেগুলো দ্রুত সাজিয়ে দিয়ে ফাঁকা ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে ডান দিকের প্যাসেজে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পারমিতা বেশ কয়েক বার রাহুলের সঙ্গে নাম-করা, এয়ার-কন্ডিশনড হোটেলে খেতে গেছে কিন্তু এত সুন্দর, কারুকার্যময় ক্রকারি আগে আর দেখেনি। সুখাদ্যেরও ছড়াছড়ি। দামী চটোলেট, কেক, তালশাঁস সন্দেশ, সিঙাড়া, সরভাজা, ক্ষীরের পান্তুয়া, চিকেন কাটলেট, নানা ধরনের বিস্কুট, কাজুবাদাম ইত্যাদি।

পারমিতা শুনেছে, বনেদি বাড়িতে আতিথেয়তার কোনওরকম ত্রুটি হয় না। এখানে এসে নিজের চোখেও তাই দেখতে পেল। স্বর্ণলতা একটা ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলে তার ওপর প্লেট রেখে বিভিন্ন পাত্র থেকে কাটলেট, সন্দেশ এবং কাজুবাদাম তুলে নিয়ে পারমিতার হাতে সেটা দিতে দিতে বললেন, 'খাও। আর যা যা ইচ্ছে হয় নিজে নিয়ে নিও।'

জ্যোতিভূষণ এবং রাহুলও খাবার তুলে নিয়েছিল। পারমিতাকে দেওয়ার পর স্বর্ণলতাও নিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

অত্যন্ত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাটলেটের একটা টুকরো কেটে মুখে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পারমিতা।

স্বর্ণলতা এবার বললেন, 'সোনু তোমার সম্বন্ধে আমাকে কিছু জানিয়েছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। শুনেছি তুমি একটা চাকরি কর।'

মেয়েদের চাকরি করাটা এ বাড়ির মানুষদের চোখে কতটা অন্যায় পারমিতা জানে না। আবছা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। চাকরি না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। তাই—'

স্বর্ণলতা কিছু একটা আন্দাজ করে বললে, 'না না, চাকরি করাটা অপরাধ, এ আমি বলছি না। শুধু জানতে চাইছিলাম।'

জ্যোতিভূষণ এই প্রথম মুখ খুললেন, 'সবারই সাবলম্বী হওয়া উচিত। ইউরোপ আমেরিকায় সব মেয়েই কিছু না কিছু করে। অনেকে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, বিরাট বিরাট বিজনেস অর্গানাইজেশন চালায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পর্যন্ত কোথায় নেই মেয়েরা? আমার কথা, আমাদের দেশেও এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে। এটা ভাল লক্ষণ।'

স্বামীর কথায় স্বর্ণলতা খুব একটা কান দিলেন বলে মনে হল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় কাজ কর?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু ল'ইয়ারেরা যেভাবে উলটোপালটা জেরা করে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায়; স্বর্ণলতার উদ্দেশ্যও যেন তাই। সতর্ক ভঙ্গিতে সে উত্তর দিল, 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সিতে।'

'বড় কোম্পানি?'

'না, মাঝারি ধরনের।'

'এমপ্লয়ী কতজন?'

'সব মিলিয়ে বাইশ।'

'তোমাকে কী করতে হয়?'

'আমি কম্পিউটার সেকশনের চার্জে আছি। সেই সঙ্গে ক্লায়েন্টদের এয়ার আর রেলের টিকিটের ব্যবস্থা করতে হয়।'

স্বর্ণলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কম্পিউটারের কোর্স কোথায় করেছিলে?'

একটা বিখ্যাত ইনস্টিটিউটের নাম করে পারমিতা বলল, 'ওরাই কোর্স কমপ্লিট করার পর এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।' সে জানে এই সব কথাবার্তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। আসল লক্ষ্যে ঘা মারার আগে স্বর্ণলতা প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন।

পারমিতার খেতে ইচ্ছা করছিল না। ধীরে ধীরে হাতের প্লেটটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রাখল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'এ কি, তুমি তো কিছুই খেলে না।'

'আজ দুপুরে খেতে খেতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই—' কথাগুলো মিথ্যে করেই বলল পারমিতা। আজ এ বাড়িতে আসবে বলে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিল। অন্যদিনের মতো সাড়ে ন'টায় খেয়ে সে গিয়েছিল বালিগঞ্জের এক বিউটি পার্লারে। সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। চুল বাঁধিয়ে বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই মারুতি ওমনি নিয়ে চলে গিয়েছিল রাহুল।

কোনওরকমে শাড়িটাড়ি পালটে তার সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে। সাড়ে ন'টার পর এক কাপ চাও জোটেনি। স্বাভাবিকভাবেই খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু উত্তেজনা, ভয়, মানসিক চাপ, সব মিলিয়ে খিদের অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

স্বর্ণলতা জোর বা অনুরোধ কোনওটাই করলেন না। নিঃশব্দে নিজের খাওয়া শেষ করে চারটে কাপে টিপট আর মিল্কপট থেকে লিকার এবং দুধ ঢেলে পারমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চা নিশ্চয়ই খাবে?'

গরম চা হয়তো স্নায়ুগুলোকে খানিকটা স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। পারমিতা মাথা হেলিয়ে দেয়—খাবে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার চায়ে ক'টা সুগার কিউব দেব?'

পারমিতা বলল, 'দুটো।'

রাহুল আর পারমিতার কাপে দুটো করে, তাঁর এবং জ্যোতিভূষণের কাপে একটা করে সুগার কিউব দিয়ে চা তৈরি করে ফেললেন স্বর্ণলতা।

রাহুলদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সবাই চায়ের কাপ তুলে নিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'শুনেছি তোমার মা-বাবা, ভাইবোন, কেউ নেই।'

পারমিতা বলল, 'না।'

'অন্য আত্মীয়স্বজন?'

'দুই কাকা আর এক মামা আছেন। কাকারা দু'জনেই দিল্লিতে। মামা আছেন জব্বলপুরে। ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। দু-তিন বছর পর কলকাতায় এলে দেখা করে যান।'

স্বর্ণলতা সামনের দিকে ঝুঁকে এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়িতে তুমি কি একলাই থাকো?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, স্বর্ণলতা তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে অতল খাদের দিকে টেনে নিয়ে চলেছেন। নীচু গলায় বলল, 'আমার এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসিমাও আমার সঙ্গে থাকেন।'

স্বর্ণলতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর তোমার মেয়ে?'

এই প্রশ্নটা যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে সেটা জানতো পারমিতা। তার হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল যেন। মুখ নামিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, 'আমার কাছেই থাকে। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি, পিসিমা দেখাশোনা করেন।'

জ্যোতিভূষণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

স্বর্ণলতার ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। বললেন, 'কী হল? উঠলে যে?'

জ্যোতিভূষণ বললেন, 'আমার একটা জরুরী কাজ আছে। এখনই বেরুতে হবে।'

'এখানকার কাজটাও কম ইমপর্টান্ট নয়। তোমার সামনেই সব কথা হওয়া দরকার।'

জ্যোতিভূষণকে আটকানো গেল না। 'তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে—' বলতে বলতে ডান দিকের একটা বেডরুমে চলে গেলেন।

চকিতের জন্য পারমিতার মনে হল, এরপর যে অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা উঠতে চলেছে, জ্যোতিভূষণ সেটা শুনতে চান না।

স্বর্ণলতা একটু বিরক্ত হলেন, 'কোনও মানে হয়? প্রবলেম এলে অ্যাভয়েড করাটা ভদ্রলোকের চিরকালের স্বভাব।' বলে আবার পারমিতার দিকে তাকালেন, 'তোমার মেয়ের বয়েস কত?'

'পাঁচ।'

'স্কুলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বাড়ির কাছেই একটা প্রিপেরেটরি স্কুলে পড়ছে। মর্নিং ক্লাস। পিসিমাই ওকে দিয়ে আসেন, নিয়েও আসেন।'

খানিকটা সময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেটে যায়।

তারপর স্বর্ণলতা বলেন, 'এবার সবচেয়ে অপ্রিয় কথাটা বলতে হবে।'

পারমিতা কিছু বলল না। বধ্যভূমিতে চরম মুহূর্তের জন্য যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে কতদিন আগে?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল পারমিতার। বলল, 'তিন বছর।'

'কারণটা কী ছিল?'

পারমিতা জানালো, তার প্রথম পক্ষের স্বামী মনোতোষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র এবং মদ্যপ। তার সঙ্গে মানিয়ে চলার অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু কোনওভাবেই সম্ভব হয়নি। আত্মরক্ষার জন্য বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার মেয়েকে যে নিজের কাস্টোডিতে রেখেছ, তাতে তোমার এক্স-হাজব্যান্ড আপত্তি করেনি?'

পারমিতা বলল, 'করেছে। কিন্তু আমি নিজের রাইট ছাড়িনি। ওর কাছে

থাকলে মেয়েটা মানুষ হত না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোর্টে আপিল করেছিলাম। জজ ওকে আমার হাতে তুলে দেন।'

স্বর্ণলতা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার যে পিসিমার কথা বললে তিনি কি তোমার ডিপেন্ডান্ট? মানে তুমি আশ্রয় না দিলে তাঁর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?'

'আছে। পিসির এক দেওরের ছেলে কানপুরে থাকে। সে অনেক বার ওঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমিই নিজের স্বার্থে ধরে রেখেছি।'

'তোমার পিসিমা সম্পর্কে তাঁর দেওরের ছেলে কি এখনও ইন্টারেস্টেড?'

'নিশ্চয়ই। গত মাসেও চিঠি লিখেছিল।'

স্বর্ণলতা কিছুটা আরাম বোধ করলেন যেন। বললেন, 'ওদিক থেকে তা হলে সমস্যা থাকছে না। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কোনও ডিসিসন নিয়েছ?'

পারমিতা চুপ করে প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করে।

স্বর্ণলতা ফের বললেন, 'আমি বলতে চাইছি, সোনুর সঙ্গে তোমার বিয়েটা যদি হয়ই—যদিও এ জাতীয় বিয়ে আমাদের পছন্দ নয়—তোমার মেয়ের কী হবে? সে কোথায় থাকবে?'

পারমিতা এতটাই চমকে উঠল যে তার গলা থেকে দুর্বোধ্য গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

স্বর্ণলতা থামেননি, 'আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছেন, দুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা আছেন। এই বিয়েটা তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। তবু সোনুর জেদে আমরা রাজী হয়েছি। মেয়ের ব্যবস্থা করে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে হবে।'

পারমিতা বিহুলের মতো তাকিয়ে থাকে। একসময় রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা করব?'

'সেটা তোমাকেই ভাবতে হবে। তবে একটা পরামর্শ দিতে পারি। সেটা করা যায় কিনা চিন্তা করে দেখতে পার।'

'বলুন—'

'তোমার আগের স্বামী কোথায় থাকে?'

'বাঙ্গালোরে।'

'মেয়েকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার।'

অবসন্ন গলায় পারমিতা বলল, 'তা কী করে সম্ভব?'

স্বর্ণলতার চোখেমুখে কঠোরতা ফুটে বেরোয়। বলেন, 'অসম্ভব কেন?'

পারমিতা বোঝাতে চেষ্টা করে, রীতিমত যুদ্ধ করে কোর্ট থেকে সন্তানের অধিকার সে আদায় করে নিয়েছে। এখন যেচে তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াটা শুধু অসম্মানজনকই নয়, সাঙ্ঘাতিক পরাজয়ও। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, মনোতোষ ফের বিয়ে করেছে। তার নতুন সংসারে মেয়েটা কতটা যত্ন, সমাদর আর স্নেহ পাবে সে সম্পর্কে পারমিতার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

স্বর্ণলতাকে এবার রোবোটের মতো দেখায়। ভাবলেশহীন মুখে তিনি বলেন, 'আমার যা বলার বলেছি। এখন তুমি কী করবে, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।'

রাহুল তার প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মাকে খুব ভয় পায় এবং তাঁর সামনে কুঁকড়ে থাকে। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। ঢোক গিলে বলল, 'মা, তুমি বাচ্চাটার কথা সিমপ্যাথেটিক্যালি—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমরা যথেষ্টই অ্যাডাল্ট। ইচ্ছা করলে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করতে পার। তেমন কিছু করলে এ বাড়ির সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়লেন। অর্থাৎ এ নিয়ে আর কোনও আলোচনাই করবেন না।

আচ্ছন্নের মতো পারমিতাও উঠে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর রাহুলের পাশে বসে টালিগঞ্জের দিকে যেতে যেতে দূরমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল পারমিতা।

কলকাতা মেট্রোপলিসে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। কর্পোরেশনের আলো এবং বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির নিওন সাইন এর মধ্যেই জ্বলে উঠেছে। অজস্র আলো, গাড়ির স্রোত, মানুষের ভিড়, দু'ধারের উঁচু উঁচু সব বাড়ি এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না পারমিতা। চোখের সামনে থেকে সব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে দুরন্ত এক উজান টানে সে কয়েক বছর পেছনে ফিরে যেতে থাকে।

তার বাবা বনবিহারী দত্ত ছিলেন একটা বড় মার্চেন্ট ফার্মের বড়বাবু। আই. এ পাস করে ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। প্রোমোশন পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত রিটায়ারমেন্টের কিছু আগে একটা সেকশানের ইন-চার্জ হতে পেরেছিলেন। খুব একটা উচ্চাশা তাঁর ছিল না। চাকরিতে আরও উঁচুতে যে উঠতে পারেননি সে জন্য আক্ষেপও না। মাঝারি মাপের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গতানুগতিক দিন কাটিয়ে গেছেন। অত্যন্ত শান্ত, নির্বিরোধ, ভদ্র মানুষ। মা-ও বাবার মতো

সাদামাঠা, সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ বিশেষ বুঝতেন না। এঁদের মেয়ে পারমিতার কিন্তু কিছু উচ্চাকাঙক্ষা ছিল। ম্যাড়মেড়ে জীবনযাপনের কথা সে ভাবতে পারত না। তবে যা সে চায় সেটা না পেলে ছিনিয়ে নিতে হবে, এমন তীব্র, আগ্রাসী ব্যাপারও তার মধ্যে ছিল না। যা ছিল তা হল কোমল, রঙিন, গোপন একটি স্বপ্ন। ভাল বিয়ে হবে, স্বামী হবে সুদর্শন, শিক্ষিত, প্রচুর অর্থ থাকবে তাদের, হাতের সামনে সাজানো থাকবে আরামের অজস্র উপকরণ।

কখনও কখনও অলৌকিকভাবে ইচ্ছাপূরণ ঘটে যায়। পারমিতার জীবনেও তাই হয়েছিল। ইংরেজিতে মোটামুটি একটা অনার্স পেয়ে বি. এ পাস করার তিন মাসের মধ্যে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। এর ভেতর প্রেমটেমের কোনও ব্যাপার নেই। তার মায়ের এক মাসতুতো বোন, সম্পর্কে মাসি, এই সম্বন্ধটা এনেছিলেন। মনোতোষরা একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, তাদের দাবিদাওয়া কিছু নেই, খবরটা পেয়েই মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

স্বাস্থ্যবান, এম বি এ স্বামী, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে তার একজিকিউটিভ পোস্ট, বিরাট স্যালারি, পর্যাপ্ত পার্কস, কেয়াতলায় বারো শ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কোম্পানির গাড়ি; প্রতি বছর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ানোর জন্য অঢেল ট্র্যাভেল অ্যালাওয়েন্স অর্থাৎ পারমিতার স্বপ্নের মাপে মাপে সমস্ত কিছু মিলে গিয়েছিল।

দুটো বছর ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই পারমিতা জেনে গেছে, মনোতোষ ড্রিঙ্ক করে। মদ্যপানটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে ট্যাবুর মতো। প্রথম প্রথম পারমিতার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হত। মনোতোষ বুঝিয়েছে, বিশাল কোম্পানির একজিকিউটিভ পোস্টে কাজ করতে হলে পার্টিতে যেতে হয়, পার্টিতে গেলে ড্রিঙ্ক করতে হয়। ক্রমশ এটা মানিয়ে নিয়েছিল সে। এর মধ্যে তাদের একটি মেয়েও হয়ে গেছে—রুনি।

কিন্তু একদিন জানা গেল, নারীঘটিত নানা স্ক্যান্ডালও রয়েছে মনোতোষের। এই নিয়ে রোজ খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি। মাঝরাতে আকণ্ঠ হুইস্কি খেয়ে এসে সারা তল্লাট মাথায় তুলে চিৎকার জুড়ে দিত সে। সারাক্ষণ অপমান আর লাঞ্ছনা। প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিত, দয়া করে একজন কেরানির মেয়েকে বিয়ে করেছে। পারমিতাকে মুখ বুজে সব সয়ে যেতে হবে। অশান্তি শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এনে তারা আলাদা হয়ে গেল। মেয়েকে নিয়ে প্রচণ্ড টানাহেঁচড়া হয়েছে, পারমিতা তার স্বত্ব ছাড়েনি।

আলাদা হাওয়ার পর রুনিকে নিয়ে টালিগঞ্জে মা-বাবার কাছে চলে এসেছিল সে। বনবিহারী ততদিনে রিটায়ার করেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটির যে টাকাটা পেয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট তুলতেন। তাতে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু পারমিতারা চলে আসায় বাড়তি চাপ পড়ল।

পারমিতা ইচ্ছা করলে মনোতোষের কাছ থেকে তার মেয়ের ভরণপোষণ আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু যার সঙ্গে সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে তার টাকা হাত পেতে নিতে ঘৃণাবোধ করত সে।

তার আত্মসম্মান বোধ ছিল প্রচণ্ড। শুধু সেটা ধরে বসে থাকলে তো বাঁচা যায় না। পারমিতার চোখে পড়ছিল, সংসার চালাতে বনবিহারী নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছেন। সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় নিরুদ্বেগ শান্তিতে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন তা নয়। ফের একটা পার্ট টাইম কাজ জোগাড় করে নিতে হয়েছিল তাঁকে।

বাবার দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হত পারমিতার। সে বুঝতে পারছিল, এভাবে চলতে পারে না। বনবিহারী অনন্তকাল থাকবেন না, তাঁর মৃত্যুর পর তাদের কী হবে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।

ক' বছর ধরেই কম্পিউটারে ট্রেনিং নেওয়া লোকজনের চাহিদা বেড়ে গেছে। তাদের কাছে চাকরি-বাকরির প্রচুর সুযোগ। একটা নাম-করা ট্রেনিং সেন্টারে দশ মাসের কোর্স কমপ্লিট করার পর ওরাই পারমিতাকে 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে চাকরিটা পাইয়ে দেয়। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ক্রমশ কাটতে থাকে তার।

বছরখানেকের ভেতর পারমিতা জীবনটাকে যখন ফের গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে সেই সময় একমাস আগে-পরে আচমকা মা আর বাবার মৃত্যু হল। পারমিতার সামনে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। বাড়িতে সে এবং রুনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে একা ফেলে কী করেই বা অফিসে যায়? মেয়ের দেখাশোনা করতে হলে চাকরি ছাড়তে হয় আর চাকরি ছাড়লে খাবে কী? পারমিতার যখন এইরকম দিশেহারা অবস্থা সেইসময় সমস্যাটা সামলে নেওয়া গেল। দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে যায় সে। ষাটের কাছাকাছি বয়স, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্য ভাল এবং পিছুটান বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া মানুষটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। বাড়ির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেল পারমিতা।

স্বপ্নভঙ্গ আগেই হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত সুখ বা সাধ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। পারমিতার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল, রুনিকে বড় করে তোলা। রাজলক্ষ্মী যতদিন থাকবেন তার দুর্ভাবনা নেই কিন্তু কোনওদিন যদি তিনি চলে যেতে চান বা মারা যান? মানুষের মতিগতি বা আয়ুর কথা তো কিছু বলা যায় না। ভাবনাটাকে অবশ্য বিশেষ আমল দেয়নি সে। আগেভাগে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলার মানে হয় না।

রাজলক্ষ্মী আসার পর মসৃণভাবেই দিন কাটতে থাকে। দুশ্চিন্তা হয়তো নেই, তবে সব কিছুই গতানুগতিক, একঘেয়ে। সকালে উঠে বাজারে যাওয়া, তারপর মেয়েকে পড়িয়ে চা খেতে খেতে সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টার ভেতর স্নান সেরে, ভাত খেয়ে চার্টার্ড বাসে অফিসে ছোটা। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মেয়েকে এ বেলাও কিছুক্ষণ পড়িয়ে ঘণ্টাখানেক টিভি দেখে রাতের খাওয়া চুকিয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়া। এই তার দৈনন্দিন রুটিন। কোনওরকম উত্থানপতন নেই। একটা দিন আরেকটা দিনের যেন জেরক্স কপি।

জীবনে যখন ধীর চালে সরলরেখায় এগিয়ে চলেছে, সেইসময় হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল পারমিতা। একদিন দুপুরে রাহুল 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে এল। সে একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অফিসার। 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি' ওদের যাবতীয় ট্রেন আর প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে দেয়। রাহুলের জরুরী কাজে বম্বে যাওয়ার কথা। প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কী একটা গোলমালের জন্য রাহুলকে ট্র্যাভেল এজেন্সিতে আসতে হয়েছিল।

এয়ার টিকেটের ব্যাপারগুলো পারমিতাই দেখাশোনা করে। রাহুল তার সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটা জানাতেই আধ ঘণ্টার ভেতর সে সব ঠিক করে দেয়।

রাহুল যে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সেটা প্রথম আলাপের দিনই টের পেয়েছিল পারমিতা। টিকেটের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে রাহুল। মাঝে মাঝেই তাকে ফোন করত। খুবই সাধারণ কথাবার্তা। কেমন আছেন, নিজে থেকে আমার খোঁজ নেন না, আমাকেই খবর নিতে হয়, ইত্যাদি।

রাহুলের ফোন এলে গোড়ার দিকে অস্বস্তি বোধ করত পারমিতা। একটা বড় কোম্পানির সুদর্শন তরুণ অফিসার ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজের বাইরে তার সম্বন্ধে একটু বেশিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এটা ভেতরে ভেতরে তাকে আড়ষ্ট করে তুলত। যতই চাকরি-বাকরি করুক, অনেকগুলো মধ্যবিত্ত ট্যাবু তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তার খোঁজখবর নেওয়াটা যে আদৌ

শোভন নয় তা কিন্তু কিছুতেই রাহুলকে বলতে পারত না পারমিতা।

কেননা ওদের কোম্পানিকে সারভিস দিয়ে তাদের এজেন্সি বহু টাকা কমিশন পায়। রাহুল চটে গেলে ওরা হয়তো অন্য এজেন্টের কাছে চলে যাবে। কাজেই ভদ্রতা বজায় রেখে সংক্ষেপে তার কথার উত্তর দিত সে।

দু-একমাস এভাবে চলার পর একদিন রাহুল ফোনে বলল, 'বুঝলেন ম্যাডাম, ঠিক জমছে না।'

বুঝতে না পেরে পারমিতা জিজ্ঞেস করেছে, 'কী জমছে না?'

'এই আলাপটা। দু-চারদিন পর ফোনে কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় কি স্যাটিসফ্যাকশন হয়?'

পারমিতা চুপ করে থেকেছে।

রাহুল গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে এবার বলেছে, 'অফিসের বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হতে পারে না?'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'কেন বলুন তো?'

রাহুল বলেছে, 'ধরুন গল্প করব।'

পারমিতা বলতে যাচ্ছিল কলকাতায় কয়েক লাখ সুন্দরী মেয়ে আছে; ওদের বাদ দিয়ে গল্প করার জন্য তাকেই বা বেছে নেওয়া হল কেন?

শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না।

রাহুল এবার বলেছে, 'আমাকে ভদ্রলোক ভাবতে পারেন। আপনার অস্বস্তির কারণ নেই।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলছে, 'ঠিক আছে। কোথায় দেখা হবে, বলুন—'

'আমি আপনাদের অফিস থেকে আপনাকে তুলে নেব।'

'না। আমাদের অফিসে আসার দরকার নেই। আপনার গাড়িতেও উঠব না।'

'তা হলে?'

'আমাদের অফিস থেকে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম খুব কাছেই। ছুটির পর আমি ওটার মেইন গেটের সামনে ওয়েট করব। তবে একটা কথা—'

'বলুন—'

'আমি সাড়ে ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরি। আজও ফিরব।'

'তাই হবে।'

সেই শুরু। তারপর অনেক বার তাদের বাইরে দেখা হয়েছে। ক্রমশ পারমিতা বুঝতে পেরেছে, রাহুল খুবই ভদ্র, প্রাণবন্ত, হৃদয়বান যুবক। কোনওদিন এমন একটি কথা উচ্চারণ করেনি কিংবা ইঙ্গিত দেয়নি যা অশালীন বা নোংরা।

কবে থেকে যে রাহুল সম্পর্কে সে আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে এবং কখন কীভাবে পরস্পরের অনেক কাছে এসে পড়েছে, নিজেরই খেয়াল নেই পারমিতার। প্রথম দিকের সেই আড়ষ্টতা বা অস্বাচ্ছন্দ্য কোনওটাই আর ছিল না। যত দেখছিল ততই মনে হচ্ছিল রাহুল কখনও তার ক্ষতি করবে না। রাহুলের ওপর তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, অসঙ্কোচে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসত। রাহুলের সঙ্গে রোজ দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে প্রতিদিন ফোনে একবার কথা বলতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আগে ওর গাড়িতে ওঠার কথা বললে বুক কেঁপে উঠত। পরে সংশয় বা ভীতি পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল। পারমিতা বুঝতে পেরেছিল, তার অমর্যাদা হয় এমন কিছুই করবে না রাহুল। কোনও কোনও দিন অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেলে রাহুল তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। পারমিতা কিন্তু তাকে ভেতরে যাওয়ার কথা বলত না। রাজলক্ষ্মী আছেন, রুনি আছে, ওরা রাহুলের বাড়িতে আসাটা কী চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে তার প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা এবং দ্বিধা ছিল। রাহুল এমনই ভদ্র যে কোনওদিন বাড়ি নিয়ে যেতে বলেনি। হয়তো ভেবেছে, পারমিতার নিশ্চয়ই অসুবিধা আছে।

রাহুল যে বিরাট অভিজাত বংশের ছেলে; ক্রমশ জেনে গিয়েছিল পারমিতা। নিজের কথা অবশ্য কিছুই বলেনি সে।

পরিচয়ের পর পাঁচ-ছ মাস কেটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে বসে খেতে খেতে রাহুল হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'বেশ কিছুদিন আমরা মিশছি। একজন আরেক জনকে এতদিনে জানা হয়ে গেছে। এবার বোধহয় আমাদের একটা ডিসিসন নেওয়া দরকার।'

মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব যে অনিবার্য পরিণতির দিকে যাবে সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছিল পারমিতা। শুরুতেই রাহুলের মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার কিন্তু পারেনি। বহুদিন গভীর রাতে সারা কলকাতা যখন গাঢ় ঘুমের আরকে ডুবে আছে, সেই সময় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারায়-ভরা নিঝুম আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলেছে সে। বুঝেছে রাহুলকে ঘিরে একটা রঙিন স্বপ্নকে সে-ও তো কম প্রশ্রয় দেয়নি। তার গোপন লোভও কম ছিল না। তবু ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে পারমিতা চমকে উঠেছে। মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থেকেছে সে; তারপর খুব নীচু কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমি তোমাকে জেনেছি ঠিকই, কিন্তু

তুমি আমার কিছুই প্রায় জানো না।

'যেটুকু জেনেছি সেটাই যথেষ্ট। তার বেশি কিছু দরকার নেই।'

'ডোন্ট বি ইমোশনাল রাহুল। আবেগ জিনিসটা ভাল কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের হলে পরে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়। তখন দেখবে আজ যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটা ভেঙেচুরে দু'জনের মধ্যে তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

পারমিতার কণ্ঠস্বর এমনই ভারী, গম্ভীর এবং আবেগশূন্য যে চকিত হয়ে উঠেছে রাহুল। তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলেছে, 'এগ্‌জাক্টলি তুমি কী চাইছ?'

পারমিতা বলেছে, 'কোনও কিছু গোপন না রেখে নিজের সব কিছু জানাতে। আগেই বলতে পারতাম কিন্তু পারিনি। সেটা যেমন ছিল আমার দুর্বলতা, তেমনি অন্যায়ও।'

রাহুল খানিকটা নিরুপায়ভাবেই যেন বলেছে, 'ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে, বল। তবে মনে মনে আমি যা ভেবে রেখেছি সেটা কোনওভাবেই বদলাবে না।'

তার কথা যেন শুনতেই পায়নি পারমিতা। দূরমনস্কর মতো নিজেদের মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, মা-বাবার মৃত্যু, রুনিকে নিয়ে টিকে থাকার জন্য ধারাবাহিক লড়াই—একটানা, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে গেছে সে।

তার কথা শেষ হওয়ার পর রেস্তোরাঁর সেই কোণটিতে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, কারও খেয়াল নেই।

একসময় রাহুল বলে উঠেছে, 'সব শুনলাম।'

মুখ তুলে রাহুলের দিকে তাকিয়েই দ্রুত নামিয়ে নিয়েছিল পারমিতা। কিছু বলতে চাইছিল, পারেনি। হাজারটা এস্রাজে একসঙ্গে এলোপাথাড়ি ছড় টানলে যেমনটা হয়, তার বুকের ভেতর তাই যেন ঘটতে লাগল। রাহুল এরপর কী বলবে, সেটা বুঝিবা তার জানাই আছে। তবু সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রাহুল বলেছে, 'আজকের সোসাইটিতে এমনটা ঘটতেই পারে। তুমি যে সো-কলড সতী সাধ্বীদের ট্র্যাডিশনের ফাঁদে পা দিয়ে একটা বাজে লোকের সঙ্গে থেকে বাকি জীবনটা নষ্ট করে দাওনি, বরং সাহস করে ডিভোর্স নিয়ে বেরিয়ে এসেছ, সে জন্যে শ্রদ্ধাই হচ্ছে। আমার দিক থেকে তোমার ব্যাপারে কোনওরকম হেজিটেশান নেই।'

তীব্র, অসহ্য আবেগে, নাকি সুখে, পারমিতার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উথলপাথল

হয়ে যাচ্ছিল। রাহুলের মতো এমন উদার, এমন সহৃদয় মানুষ আগে সে কখনও দেখেনি। কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, সুখ—এ সবের মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা যে ছিল না তা নয়। সে বলেছে, 'কিন্তু রুনি—'

এবার যেন একটু থমকে গেছে রাহুল। বলেছে, 'মনে হয় সমস্যা হবে না। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের বংশে এমন বিয়ে তো কখনও হয়নি। মা-বাবাকে, বিশেষ করে মাকে বোঝাতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাহুলই আবার বলেছে, 'সময় হয়তো লাগবে। বাট উই শ্যাল ডেফিনিটলি ওভারকাম।'

পারমিতা উত্তর দেয়নি।

রাহুল এবার বলেছে, 'অনেকদিন ধরেই তোমাদের বাড়ি যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে। সাহস করে বলতে পারিনি। একদিন নিয়ে যাবে?'

অর্থাৎ তারা কেমন পরিবেশে থাকে, সেটাই হয়তো দেখতে চেয়েছে রাহুল। পারমিতা বলেছিল, 'আজই চল না—'

সেই যে টালিগঞ্জে আসা শুরু হয়েছিল, তারপর প্রায়ই আসত রাহুল। রুনি এমনিতে গায়ে-পড়া, মিশুকে মেয়ে। যেমন আদুরে তেমনি হাসিখুশি। মায়ের সবটুকু সৌন্দর্য নিংড়ে নিয়ে সে অলৌকিক ফুলের মতো হয়ে উঠেছে। তাকে ভাল না লেগে পারা যায় না। প্রথম দিনই রাহুলের সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শুধু রুনিই না, রাহুলের মার্জিত, মধুর ব্যবহারে রাজলক্ষ্মীও মুগ্ধ হলেন।

বার কয়েক যাতায়াতের পর একদিন রাজলক্ষ্মী বলেছিলেন, 'ছেলেটা খুব ভাল রে। ও কেন আসে বুঝতে পারি—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল পারমিতার। সে পিসির দিকে তাকাতে পারেনি। বিব্রতভাবে লাজুক কিশোরীর মতো হাতের নখ খুঁটে যাচ্ছিল।

রাজলক্ষ্মী পারমিতার পাশে বসে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করেছেন, 'রাহুল কি তোকে কিছু বলেছে?'

মাথা হেলিয়ে অস্ফুট গলায় পারমিতা বলেছে, 'হ্যাঁ।'

রাহুল কী বলে থাকতে পারে, সেটা রাজলক্ষ্মী যেন জানেন। বলেছিলেন, 'তা হলে আর আপত্তি করিস না।'

পারমিতা চুপ।

রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'কী-ই বা বয়েস তোর! সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। তুই রাজী হয়ে যা মা।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলেছে, 'আমি রুনির কথা ভাবছি পিসি।'

'রাহুল যদি তোকে মেনে নিতে পারে, রুনিকেও পারবে।'

'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে পারমিতার সঙ্গে কাজ করে রোহিণী। তার অনেক আগে থেকেই রোহিণী ওখানে চাকরি করছে। মেয়েটা পাঞ্জাবি হিন্দু, তার মতোই ডিভোর্সি, বৃদ্ধ রিটায়ার্ড বাবাকে নিয়ে ভবানীপুরের একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। তার মা নেই, নিজের ছেলেমেয়েও হয়নি। মোটামুটি ঝাড়া হাত-পা।

রোহিণী পারমিতার খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সত্যিকারের বন্ধু। তাকেও রাহুলের ব্যাপারটা জানিয়েছে সে। কী করা উচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শও চেয়েছে।

রোহিণী বলেছে, 'ছেলেটাকে তো ভীষণ সিমপ্যাথেটিক মনে হচ্ছে। তুই আপত্তি করিস না। তবে রুনির ব্যাপারটা ঠিক করে নিবি।' রোহিণীর জন্ম কলকাতায়। সে চমৎকার বাংলা বলতে পারে।

এরপর রাহুলের সঙ্গে যত বারই দেখা হয়েছে, পারমিতা জিজ্ঞেস করেছে, 'মাকে আমাদের কথা বলেছ?'

রাহুল বিব্রতভাবে বলেছে, 'এখনও বলিনি। মানে তেমন সুযোগ পাচ্ছি না।'

এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন রাহুল এসে বলেছিল, 'মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

পারমিতার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমি ডিভোর্সি, আমার যে একটা মেয়ে আছে, এ সব মাকে জানিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু গোপন কর নি?'

অল্প হেসে রাহুল বলেছে, 'গোপন করে লাভ আছে? ধরা তো পড়তেই হবে। তা ছাড়া আমরা অন্যায় কিছু করছি না।'

পারমিতা উত্তর দেয়নি।

রাহুল আবার বলেছে, 'মাকে জানিয়ে দিয়েছি তোমাকে ছাড়া অন্য মেয়ের কথা আমি আর ভাবতে পারব না।'

পারমিতা এবারও চুপ করে থেকেছে।

রাহুল থামেনি, 'মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'আমাকে!' পরক্ষণে মনে হয়েছে, ছেলে কাকে

পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে চাইছে তাকে দেখতে চাওয়াই তো স্বাভাবিক।

রাহুল বলেছে, 'হ্যাঁ। কবে যেতে পারবে বল—'

'যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে কী হবে?' পারমিতা বলেছে, 'তুমি যেদিন বলবে।'

রাহুল আজকের দিনটা ঠিক করেছিল।

কতক্ষণ মারুতি ওমনির জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই পারমিতার। কখন যে গাড়িটা তাদের টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেটাও লক্ষ করেনি।

রাহুল আস্তে ডাকল, 'পারমিতা—'

আশ্চর্য কোনও টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে গিয়েছিল পারমিতা। আবার সে এই সময়ে ফিরে এল। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেল বাজাতে রাজলক্ষ্মী দরজা খুলে দিলেন। পারমিতা ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকতেই রুনি এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল সে।

রাহুলও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে কিন্তু বসল না। পারমিতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল, 'অত ভেঙে পড়ো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পারমিতা কিছু বলল না।

রাহুল এবার বলল, 'আমি আজ যাই। কাল আবার আসব।'

রাহুল চলে যাওয়ার পর রুনি জিজ্ঞেস করল, 'মা, রাহুল আঙ্কলদের বাড়িটা খুব সুন্দর, তাই না?' আজ যে পারমিতা রাহুলদের বাড়ি গিয়েছিল সেটা সে জানে।

অন্যমনস্কের মতো পারমিতা সাড়া দিল, 'হুঁ।'

'রাহুল আঙ্কল বলেছিল ওদের ছাদে অনেক পাখি, হরিণ আর খরগোস আছে। দেখেছ?'

পারমিতা উত্তর দিল না।

একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে তাকে দেখছিলেন রাজলক্ষ্মী। আজ বিকেলের দিকে পারমিতা যখন রাহুলের সঙ্গে বেরুল তখন থেকেই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। বললেন, 'ও বাড়িতে কী হল রে?' চাপা উদ্বেগ আর উত্তেজনায় তাঁর গলা যেন কেঁপে গেল।

স্বর্ণলতার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব জানিয়ে পারমিতা বলল, 'আমি কী

যে করব, বুঝতে পারছি না।' অসীম নৈরাশ্যে তার কণ্ঠস্বর বুজে যায়।

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকেন রাজলক্ষ্মী। এ এমন এক জটিল সমস্যা যে কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

প্রচণ্ড অস্থিরতা পারমিতাকে যেন ক্রমশ বিপর্যস্ত করে ফেলতে লাগল। তারই মধ্যে কোনও রকমে খাওয়া চুকিয়ে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে, কিন্তু ঘুম এল না। বার বার রুনির দিকে ফিরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবল, স্বর্ণলতার শর্ত অনুযায়ী এই মেয়েটাকে ছেড়ে সে থাকবে কী করে? কোথায়ই বা তাকে রাখবে?

পরদিন অফিসে গেল না পারমিতা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল। সমস্ত শরীর জুড়ে গভীর অবসাদ। সে টের পাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধের দিকে রাহুল এল। বলল, 'বিকেলে তোমাদের অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমার বন্ধু রোহিণী বললে, তুমি যাওনি। কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি?'

পারমিতা বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। বসো—'

রাহুলকে দেখে রুনি ছুটে এসেছিল। পারমিতা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য ঘরে রাজলক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিল।

রাহুল বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? রুনিকে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে পারমিতা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার আর্জেন্ট কিছু কথা আছে। রুনির এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।'

উৎসুক সুরে রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

পারমিতা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমার মা কাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের বাড়িতে রুনির জায়গা হবে না।'

রাহুল ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে।

পারমিতা তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার লাইফে আমার কতটা প্রয়োজন?'

রাহুল হকচকিয়ে যায়, 'এতদিন পর এরকম আননেসেসারি কথার কোনও মানে হয়?'

'হয়।'

'কীরকম?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল পারমিতা, 'জানতে চাইছি, আমার জন্য তুমি কতদূর যেতে পার?'

হেসে হেসে রাহুল বলল, 'সে তো তুমি জানোই।'

তার দিকে ঝুঁকে তীব্র গলায় পারমিতা বলল, 'তোমার মা বলেছিলেন, রুনিকে ও বাড়িতে নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে ওঁদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তুমি রুনি আর আমার জন্যে বাড়ি থেকে চলে আসতে পার?'

'মা-বাবাকে ছেড়ে?'

'হ্যাঁ। কেননা রুনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব।'

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল রাহুল। তারপর শ্বাসটানা গলায় বলল, 'আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দাও। মানে—'

পারমিতা উত্তর দিল না। রাহুলের আরেকটা দিক কালই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বর্ণলতার মুখের ওপর জোর করে সে বলতে পারেনি, পারমিতার সঙ্গে রুনিকেও 'মুখার্জি ভিলা'য় নিয়ে যাবে। সে ভীরু, দুর্বল, দ্বিধান্বিত। সারা জীবন ভাবলেও রুনির সম্বন্ধে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মতো দুঃসাহস তার নেই।

আজ সামনাসামনি বলা যাবে না। কাল চিঠি লিখে পারমিতা জানিয়ে দেবে, তার এবং রুনির সম্বন্ধে আর ভাবার প্রয়োজন নেই রাহুলের।

দুর্বোধ্য

মাধুরী যখন তাদের মাল্টি-স্টোরিড বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটটায় ফিরে এল, দশটা বাজতে বেশি দেরি নেই।

ডোর-বেল টিপতে কাজের লোক নগেন দরজা খুলে দিয়েছিল। বারো শ স্কোয়ার ফিটের এই ফ্ল্যাটটায় ঢুকলেই বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। তার ওধারে পর পর তিনটে শোওয়ার ঘর, কিচেন, স্টোর ইত্যাদি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ এসে দু-চারদিন থাকলে তাদের জন্য একটা মাঝারি মাপের গেস্ট রুমও আছে এক কোণে।

ড্রইং রুমে পা দিয়েই চমকে উঠল মাধুরী। সুরজিৎ ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। ভঙ্গিটা আলস্য মাখানো, যেন কোথাও যাওয়ার তাড়া বা ব্যস্ততা নেই। অথচ আজ ছুটির দিন নয়।

অন্যদিন ন'টা বাজতে না বাজতেই স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে তাদের নিজস্ব মেরুন রঙের নতুন মারুতি-ওমনিটা ড্রাইভ করে অফিসে চলে যায় সুরজিৎ। সে একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির একজিকিউটিভ। বয়স বাহান্ন তিপ্পান্ন, মাঝারি হাইট, বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের বাই-ফোকাল চশমা। পরনে ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি।

মাধুরীর বয়স আটচল্লিশ। পাতলা, মেদহীন শরীর। গায়ের রং একটু চাপা হলেও সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলো এখনও বিলীন হয়ে যায় নি।

কাল সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি মাধুরী। চোখ জ্বালাজ্বালা করছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে। কপালের দু'পাশের রগদুটো সমানে লাফাচ্ছে। সে ঠিক করে রেখেছিল, বাড়ি ফিরে স্নান চুকিয়ে শুয়ে পড়বে। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমের একান্ত প্রয়োজন তার। কিন্তু কে জানতো, সুরজিৎ আজ অফিসে যাবে না। তাকে দেখতে দেখতে শারীরিক কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারগুলো আর মনে রইল না মাধুরীর। অদ্ভুত এক দুশ্চিন্তা, নাকি প্রবল ভয় তার স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দ্রুত চারিয়ে যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে কয়েক পলক মাধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকে সুরজিৎ। তারপর বলে, 'তোমাকে কিরকম যেন

দেখাচ্ছে! শরীর খারাপ নাকি?'

'না, আমি ঠিকই আছি।' কোনওরকমে উত্তরটা দিয়ে রুদ্ধস্বরে মাধুরী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ অফিসে গেলে না?'

'না। প্রচুর ছুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, একটা দিন না হয় না-ই গেলাম। কী, ঠিক করি নি?' সুরজিৎ একদৃষ্টে মাধুরীর দিকে তাকিয়েই রইল।

আবছা গলায় কিছু একটা বলল মাধুরী, বোঝা গেল না।

সুরজিৎ এবার বলল, 'মনে হচ্ছে, সারারাত তোমার ঘুম হয় নি। সোজা বাথরুমে চলে যাও। স্নান করে এক কাপ কড়া চা খাও, শরীর ঝরঝরে লাগবে।'

মাধুরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। যান্ত্রিকভাবে মাথাটা হেলিয়ে দিল শুধু।

সুরজিৎ বলল, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

অনিবার্যভাবেই যে এই প্রশ্নটা উঠবে, মাধুরী তা জানতো। মা খুব অসুস্থ, এইরকম একটা অজুহাত তৈরি করে কাল ভবানীপুরে মেজদার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল সে। মা ওখানেই থাকেন। ভবানীপুরে অবশ্য ঘণ্টা খানেকের বেশি থাকে নি মাধুরী। ওখান থেকে সোজা চলে গেছে লেক টাউনে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে বাড়ি এসেছে।

মাধুরী বলল, 'অনেকটা ভাল।' বলেই মুখ নীচু করে, এলোমেলো পা ফেলে, নিঃশব্দে নিজেদের শোওয়ার ঘরে গিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

লেক টাউনে কোনওরকমে চোখমুখে জল ছিটিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাধুরী। দাঁত ব্রাশ করা হয় নি। এখন বেসিনের সামনে বিরাট আয়নায় নিজের রাত-জাগা, বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগাতে গিয়ে থমকে গেল সে। আয়নার প্রতিচ্ছবিটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল যেন। মাধুরী অনুভব করল অদৃশ্য কোনও টাইম মেশিন তাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাল সকালে মায়ের অসুস্থতার যে কারণটা খাড়া করে মাধুরী ভবানীপুরে গিয়েছিল সেটা খুব জোরালো নয়। এমনিতেই কিছুদিন ধরে মায়ের শ্বাসকষ্ট চলছে। কখনও বাড়ে, কখনও একটু কমে। কাল কিছুটা বেড়েছিল ; তবে সেটা এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয় যে তক্ষুণি ছুটতে হবে। আসলে মা নয়, বিনির জন্য

তাকে কাল যেতে হয়েছে। রাতে লেক টাউন থেকে ফেরাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিনি বা লেক টাউনের কথা সুরজিৎকে বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা বুঝতে পারছিল না বলেই মায়ের শ্বাসকষ্টের অছিলাটা খাড়া করতে হয়েছে। কিন্তু বিনিকে সরিয়ে যার মুখটা এই মুহূর্তে চোখের সামনে কোনও অদৃশ্য টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে সে নিরুপম। ভালবেসেই একদিন তাকে বিয়ে করেছিল মাধুরী। সুপুরুষ, শিক্ষিত এবং অভিজাত বংশের ছেলে নিরুপমের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাতে না পারলে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

বিয়ের পর রঙিন স্বপ্নটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বছর তিনেকের মধ্যেই সব আচ্ছন্নতা কেটে গিয়েছিল।

মাধুরীর জন্ম বনেদি বংশে হয় নি। নিরুপমদের মতো অর্থবানও তারা নয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় ওরা তা-ই। তবে পরিবারের সবাই খুব শিক্ষিত।

দু'জনের সম্পর্কটা যে ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করেছিল তার কারণ আভিজাত্য নয়। বনেদিয়ানা নিয়ে আজকাল কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। তফাতটা ছিল রুচির, এবং জীবন যাপন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার।

নিরুপম ড্রিংক করত। মদ্যপানটা ইদানীং জলভাতের মতো ব্যাপার। যদিও মাধুরী বিশেষ পছন্দ করত না, তবে মেনে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে নিরুপম লম্পট ছিল না। নারীঘটিত কোনও স্ক্যান্ডালে তাকে কখনও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় নি। তবে তার চরিত্রের যে দিকটা মাধুরীকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছে বা ক্রুদ্ধ করে তুলেছে সেটা এইরকম।

নিরুপম চাকরি টাকরি করত না। ওর ছিল খুব বড় আকারের বিজনেস। রেলওয়ে থেকে শুরু করে নানা সরকারি ডিপার্টমেন্ট, ফাইভ-স্টার হোটেল থেকে বিরাট বিরাট প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে লক্ষ লক্ষ টাকার মেটিরিয়াল সাপ্লাই করত। আর এই সাপ্লাইয়ের অর্ডার বার করার জন্য যতদূর নীচে নামা সম্ভব, নামতো। মোটা টাকার ঘুষ, বড় বড় হোটেলে রাতভর পার্টি, এসব তো সামান্য ব্যাপার। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনন্দদানের জন্য হোটেলের কামরা 'বুক' করে মেয়েদের পাঠিয়ে দিত। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল টাকা, টাকা আর টাকা। অর্থের ব্যাপারটা তার মাথায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ভর করে ছিল। সেটাই তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে সততা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা মাপকাঠি থাকে। নিরুপমের সঙ্গে বিয়ের পরও সেটাকে কোনওভাবেই বিসর্জন দিতে পারে নি মাধুরী। ওটা উত্তরাধিকার সূত্রেই তার পাওয়া। টাকা, বিদেশি পারফিউম, কালার টিভি, ফ্রিজ, মিউজিক সিস্টেম—এসব তো কাজ বাগানোর জন্য আকছার দিতে হয়। কিন্তু তাই বলে মেয়েমানুষ ঘুষ? এটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিল না সে। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল অশান্তি, তিক্ততা। একদা যে নিরুপমকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল, এখন থেকে চিন্তা শুরু হল এরকম একটা নোংরা, জঘন্য লোকের সঙ্গে বাকি দিনগুলো কাটাবে কী করে?

চোখ কান বুজে থাকলে কোনওরকম সমস্যাই হতো না। কিন্তু মাধুরীর মধ্যে ছিল এক ধরনের একগুঁয়েমি, নাকি শুচিবাই? সে কিছুতেই নিরুপমকে সহ্য করতে পারছিল না। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিয়ের চার বছরের মাথায় ডিভোর্স নিয়ে ভবানীপুরে বাপের বাড়ি ফিরে এল সে।

বাবা তখনও জীবিত। তা ছাড়া আর তিন দাদা আছেন। তাঁরা অবশ্য প্রথম দিকে মাধুরীকে মিটমাট করে নেবার জন্য অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু কারও কথা শোনে নি সে। পরে বিবাহ বিচ্ছেদটা যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন আর বাধা দেন নি।

মাত্র কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনটাকে নিশ্চিহ্ন করেই দিতে চেয়েছিল মাধুরী কিন্তু সেটা পারা যায় নি। বিয়ের পরের বছরই তার মেয়ে বিনির জন্ম। কিন্তু তাকে পায় নি সে। কোর্টের রায়ে সে নিরুপমের কাছে থেকে গিয়েছিল। তবে যখনই ইচ্ছা হবে, মাধুরী লেক টাউনে নিরুপমদের বাড়ি গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতে পারবে। সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের ওই একটাই পিছুটান থেকে গিয়েছিল।

বাপের বাড়ি ফিরে আসার বছর দেড়েক পর বাবা মারা গেলেন। দাদারা ভবানীপুরের পুরনো বাড়ি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়ে হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা করে ফ্ল্যাট পেলেন। মা পেলেন নগদ দু লাখ টাকা। পিতৃ-সম্পত্তিতে মেয়েদের আইনসম্মত অধিকার আছে। তাই মাধুরীও বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেল।

মাধুরীর প্রতি দাদা-বৌদিদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কেউ কখনও তার অনাদর করে নি। কিন্তু সময় কাটানোই হয়ে উঠেছিল বড় রকমের সমস্যা।

দিনগুলো এখন মাধুরীর কাছে বড় বেশি দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একটা চাকরি নিয়েছিল সে।

বড়দা আর ছোটদার বদলির চাকরি। নিজের নিজের ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে তাঁদের একজন চলে গেলেন দিল্লিতে; একজন বাঙ্গালোরে। মাধুরী মেজদার কাছে থেকে গেল। মা বছরে দু'মাস করে দিল্লি আর বাঙ্গালোরে দুই ছেলের কাছে থেকে আসেন; বাকি সময়টা ভবানীপুরে।

এদিকে চাকরি বাকরি করলেও জীবনটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল মাধুরীর। যেন সামনে কোনও লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। একটা দিন হুবহু আরেকটা দিনের কার্বন কপি। এইভাবেই যখন সময় কাটছিল সেই সময় হঠাৎ দূর সম্পর্কের এক মাসিমা একটা সম্বন্ধ নিয়ে এল। ছেলেটি অর্থাৎ সুরজিৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়—সচ্চরিত্র, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির একজিকিউটিভ, কোনওরকম বদ খেয়াল নেই। তবে সামান্য একটা খুঁত আছে। সুরজিতেরও আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী বাঁচে নি, বিয়ের আড়াই বছরের মধ্যে মারা যায়। ছেলেমেয়ে নেই। মাধুরী ডিভোর্সি না হলে এমন একটা সম্বন্ধ আনতে সাহস করতেন না মাসিমা।

সব শোনার পর মনে হয়েছিল ছেলেটা বেশ ভালই। মেজদা, মেজ বৌদি এবং মা বোঝাচ্ছিলেন, অযাচিতভাবে এমন একটা সম্বন্ধ যখন এসেছে তখন না বলা উচিত হবে না। বড়দা এবং ছোটদাকে চিঠি লিখলে তাঁরাও জানিয়েছিলেন, মাধুরী যেন এ বিয়েতে রাজী হয়।

মাসিমাই একদিন সুরজিৎকে সঙ্গে করে ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আলাপ করে বাড়ির আর সবার মতো মাধুরীরও ভাল লেগেছিল।

সেই যে সুরজিৎ এসেছিল, তার তিন মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময় কাছাকাছি থেকে সুরজিৎকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে মাধুরীর। মানুষটার একটা দিক খুব খোলামেলা। কখনও কখনও মনে হয় সে খুবই হৃদয়বান, সহানুভূতিশীল এবং সত্যিকারের প্রেমিক। কিন্তু তার আরেকটা দিক দুর্বোধ্য। সেখানে সে খুব চাপা, উদাসীন, হয়তো কিছুটা শীতল। সব মিলিয়ে যেমনই হোক, মাধুরীকে কখনও অসম্মান করে নি সে। তার আচরণে এতটুকু ত্রুটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ড্রিংক করে না, পার্টিতে যাওয়ার অভ্যাস নেই। অফিসের কাজে বাইরে না গেলে ঠিক ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরে আসে।

বিয়ের পরই সুরজিতের জন্য চাকরিতে রেজিগনেশান দিতে হয়েছিল মাধুরীকে। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু খুব ঠাণ্ডা গলায় সুরজিৎ বলেছিল, 'চাকরির প্রয়োজন নেই তোমার। আমি যা স্যালারি আর পার্কস পাই তাতে আমাদের মতো পাঁচটা ফ্যামিলির রাজার হালে চলে যাবে।'

সুরজিতের শান্ত কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল যে আপত্তি করতে সাহস হয় নি মাধুরীর। তার মনে হয়েছে সুরজিৎ কি প্রাচীনপন্থী, স্ত্রী চাকরি করুক, এটা কি সে চায় না? পরে কখনও কখনও ভেবে দেখেছে, হয়তো প্রচণ্ড অধিকার বোধ থেকেই এটা করে থাকবে সে। বুঝিবা সুরজিৎ বোঝাতে চেয়েছে, মাধুরী সম্বন্ধে সে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই শেষ কথা। এই নিয়ে মাধুরী আপত্তি করতে পারত কিন্তু করে নি। একটা সম্পর্ক তার নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টা শেষ হয়ে যাক, তা সে চায় নি।

একটা ব্যাপার মাধুরী লক্ষ করেছে, নিজের মৃত প্রাক্তন স্ত্রী বা তাকে নিয়ে স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনও দিন নিজের থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি সুরজিৎ। একদিন কৌতূহলের বশে মাধুরী জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'আমি পেছন দিকে তাকাতে পছন্দ করি না। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

শুধু নিজের ব্যাপারেই না, নিরুপম, বিনি এবং মাধুরীর আগেকার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মাসিমার কাছে সবই শুনেছিল সুরজিৎ কিন্তু বিয়ের পর এ বিষয়ে কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অতীত অতীতের মধ্যে বিলীন হয়ে থাক, এটাই হয়তো সে চায়।

সুরজিতের সঙ্গে বিয়ের আগে মাঝে মাঝে লেকটাউনে গিয়ে বিনিকে দেখে আসত মাধুরী। কিন্তু বিয়ের পর যেতে সাহস হতো না। সুরজিৎ বেরিয়ে গেলে ফোন করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলত। এইভাবেই এতগুলো বছর বিনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে সে। কাল সেই বিনির বিয়ে হয়েছে। নিরুপম ফোনে হাতজোড় করে বলেছিল, 'তোমাকে আসতেই হবে।'

বিনিও বার বার বলেছে, 'তুমি না এলে হবে না মা।'

মেয়েটা চিরকালের মতো পরের ঘরে চলে যাবে। লেক টাউনে না গিয়ে পারে নি মাধুরী। কিন্তু সুরজিৎকে তা জানাতে ভরসা হয় নি। মায়ের অসুস্থতার নাম করে চাতুরিটুকু করতে হয়েছিল তাকে।

বিনির বিয়ের লগ্ন ছিল মাঝরাতে। সন্ধের দিকে থাকলে কাল রাতেই ফিরে আসতে পারত মাধুরী। বিয়ে শেষ হতে হতেই ভোর হয়ে গেল। কাল তাই

আর ফেরা সম্ভব ছিল না।...

স্নান সেরে, পোশাক পালটে, চুল টুল আঁচড়ে ড্রইং রুমে চলে এল মাধুরী। এখন নিজেকে অনেকখানি তাজা মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরকার সংশয় এবং ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। সে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ অফিসে না গিয়ে সুরজিৎ বাড়িতে থেকে গেল কেন?

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় সুরজিৎ। বলে, 'এসো। বসো এখানে।' কিচেনে কাজের মেয়ে মমতা রান্না করছিল, তাকে বলল, 'দু কাপ কড়া চা করে দাও দিদি।'

একটু পরে চা খেতে খেতে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'বিনির বিয়ে ভালভাবে মিটেছে তো?'

হতচকিত মাধুরী শুধু বলতে পারে, 'তুমি—তুমি—'

সুরজিৎ এবার যা বলে তা এইরকম। কাল অফিস থেকে ভবানীপুরে ফোন করে মায়ের খবর নিতে গিয়ে সে জানতে পারে, মাধুরী ওখানে নেই, জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। কোথায় মাধুরী যেতে পারে, বার বার জিজ্ঞেস করলে সরল, ভালমানুষ মা বিনির ব্যাপারটা বলে দেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মাধুরী।

সুরজিৎ বলল, 'তুমি ফিরে আসবে, সে জন্য আজ ছুটি নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

মাধুরী কিছু বলল না।

সুরজিৎ এবার বলে, 'মেয়ের বিয়েতে যাবে, আমাকে বললেই তো পারতে। মায়ের নাম করে একটা অজুহাত খাড়া করার দরকার ছিল না।'

সুরজিৎ কি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে? মুখ তুলে যে তার দিকে তাকাবে, তেমন শক্তিটুকুও যেন আর অবশিষ্ট নেই মাধুরীর মধ্যে। শিথিল গলায় বলে, 'তুমিই তো একদিন বলেছিলে অতীত নিয়ে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরজিৎ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাই বলে মেয়ের বিয়েতে যেতে দেবো না, এমন অমানুষ, নিষ্ঠুর আমাকে ভাবলে কী করে?'

ধীরে ধীরে এবার চোখ তুলে তাকায় মাধুরী। অতীত বলতে সে কি শুধু নিরুপমকেই বুঝিয়েছিল?

সুরজিৎ বলে, 'বিনি আর জামাইকে একদিন আমাদের এখানে খেতে বলো, কেমন?'

বাইশ বছর একসঙ্গে কাটানোর পরও মানুষটাকে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মাধুরীর। তবু সুরজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন বরে যায় তাব। ঝাপসা গলার বলে, 'বলব।'

বর্ষায় একদিন

উত্তর বিহারের এই ধু-ধু মাঠটার মাঝখান দিয়ে লম্বা কাঁচা সড়ক—এ অঞ্চলে যাকে বলে 'কাচ্চি'—সোজা তিন মাইল দূরের হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে। মাঠ বলতে সবুজ ঘাসের একটানা প্রান্তর নয়, বেশির ভাগটাই উঁচুনীচু কাঁকুরে মাটির ডাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। চারিদিকে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম আর পিপর গাছ। অনেক দূরে ছোট বড় টিলার ফাঁকে ফাঁকে পেনসিলের আঁচড়ের মতো ঝাপসা দু-চারটে গাঁ।

আগের তিন দিন এ দিকে ধুম বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবে আজ সকাল থেকে ছিটেফোঁটাও ঝরেনি। জল ধরে গেলেও আকাশ জুড়ে গাভিন মোষের মতো ছন্নছাড়া মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। ভারী, জোলো হাওয়া মাঠের ওপর যেন থমকে আছে। গাছের একটা পাতাও নড়ে না। যেদিকে যত দূর চোখ যায়, সব থম-মারা, রুদ্ধশ্বাসে কীসের অপেক্ষায় যেন রয়েছে। আসলে আয়োজনে কোথাও ফাঁক নেই, যে কোনও মুহূর্তে ফের শুরু হয়ে যাবে তুমুল দুর্যোগ, লক্ষ কোটি জলের ফোঁটা সিসের ফলা হয়ে নেমে আসবে আকাশ থেকে। ভেসে যাবে সমস্ত চরাচর।

এখনও বেলা তেমন হয়নি। মেঘের কিনার দিয়ে সূর্যের যে ভীরু রশ্মিগুলো নেমে এসেছে, শ্রাবণের সকালটাকে ঝলমলে করে তোলার পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। ম্যাড়মেড়ে, নিরুত্তাপ আলো বর্ষার এই দিনটাকে যেন বড় বেশি স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে।

ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে এখানে মাটি গলে থকথকে মাংসের মতো হয়ে আছে। হাঁটতে গেলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়।

এই সকালবেলায় মাথার ওপর বর্ষার ঘন কালো মেঘ নিয়ে গলা মাটিতে গোড়ালি গেঁথে গেঁথে এগিয়ে যাচ্ছিল নাথুনি। সে আসছে আড়াই মাইল পেছনের একটা গাঁ বারহৌলি থেকে ; যাবে তিন মাইল মাঠ পেরিয়ে যেখানে হাইওয়ে, তার ওধারে নানকিপুরা টাউনে। দু'দিন ধরে তারা উপোস দিচ্ছে। গাঁয়ে কাজকর্ম নেই, তাই কামাইও নেই। শহরে গিয়ে কিছু একটা জুটিয়ে চাল-ডাল, ছাতু কি আটার ব্যবস্থা করে সন্ধের আগে আগে ফিরে আসবে।

নথুনির বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। লম্বাচওড়া মজবুত চেহারা তার, হাড়গুলো

মোটা মোটা। লম্বাটে রুক্ষ মুখ, কর্কশ চামড়া, শির বার-করা হাত, তেলহীন জটপাকানো চুল বা পায়ের নিরেট গোছ—কোনও কিছুতেই লালিত্যের চিহ্নমাত্র নেই। চোখের খর চাউনি লক্ষ করলে বোঝা যায়, দুনিয়ার কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। নারীত্বের শেষ মাধুর্যটুকু কবে তার শরীর থেকে উধাও হয়েছে, সে নিজেও বুঝি তা মনে করে রাখেনি। নাথুনির সর্বাঙ্গে পুরুষালি কঠোরতা তার নিজস্ব ছাপ মেরে রেখেছে।

এই মুহূর্তে তার পরনে তালি-মারা লাল জামা আর খাটো ময়লা শাড়ি। শাড়িটার ঝুল হাঁটুর তলায় কয়েক আঙুল নেমেই শেষ। দু'হাতে তামার বেঢপ কাংনা আর নাকের পাটায় ঝুটো পাথর-বসানো চাঁদির নাকফুল ছাড়া সারা গায়ে আর কোনও দামী ধাতুর লেশটুকুও নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে হাতখানেক কাদায় যতটা জোরে সম্ভব পা চালাতে চালাতে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নেয় নাথুনি। না, সে ছাড়া এত বড় মাঠে আর কেউ নেই। চারিদিক আশ্চর্য নিঝুম। শুধু কোথায় যেন একটা পরদেশি শুগা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দিগন্ত-জোড়া নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া আর আধপেটা খাওয়ার পরও নাথুনির শরীরে রয়েছে অসীম শক্তি; বনভৈসীদের গায়ে যেমনটা থাকে। শক্তি ছাড়াও যা আছে তা হল দুর্জয় সাহস। এত বড় বিশাল জনহীন মাঠের ওপর দিয়ে একা একা চলতে তার এতটুকু ভয় লাগছে না।

কতক্ষণ হেঁটেছিল, মনে নেই নাথুনির। হঠাৎ কার যেন ডাক আবছাভাবে ভেসে আসে, 'এ—এ আওরত—'

প্রথমটা সেভাবে খেয়াল করেনি নাথুনি। কিন্তু ডাকাডাকিটা থামে না। অগত্যা সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এধারে ওধারে তাকাতে পেছনে, অনেকটা দূরে একটা লোককে দেখতে পায়। সে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আগে যা ভাবা গিয়েছিল, মাঠটা ঠিক ততটা নির্জন নয়। নাথুনি বেশ অবাকই হয়ে যায়। তাকে না হয় পেটের দানার জন্য নানকিপুরায় যেতে হচ্ছে, কিন্তু এই লোকটা মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে বেরিয়ে এল, আর ঘোর বর্ষায় কাকপক্ষীও যখন বেরোয় না তখন তিন মাইল কাদা ভেঙে সে চলেছেই বা কোথায়? নাথুনির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা হল এই রকম। তার লালিত্য টালিত্য না-ই থাক, তবু সে একটা আওরত তো। লোকটা ভাল, না বজ্জাত, কিছুই জানা নেই। এই ফাঁকা মাঠে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে না।

মেয়েমানুষের আজন্মের সংস্কারে সমস্ত শিরাস্নায়ু টান টান করে নাথুনি অপেক্ষা করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটা কাছে চলে আসে। বয়স চল্লিশের ওধারে। আখাম্বা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, চৌকো মুখ, ভুরু দুটো যেন ইঁদুরে-খোবলানো, গালে খাপচা খাপচা আগাছার মতো দাড়ি। গায়ের রং ভুষো কালিতে আগাপাশতলা চোবালে যেমন হয় হুবহু তাই। চামড়া ফেটে ফেটে খই উড়ছে। লম্বা দুই হাত কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই বিদঘুটে চেহারার লোকটার দুই চোখে যেন আশ্চর্য জাদু মাখানো। এমন সরল, নিষ্পাপ চোখ ক্বচিৎ দেখা যায়।

লোকটার পরনে খেলো ছিটের ঠেটি ফুলপ্যান্ট আর বেখাপ্পা একটা জামা যার হাতদুটো আবার নেই; কাঁধের কাছ থেকেই ছেঁড়া। পিঠে ঢাউস একটা বোঁচকা বাঁধা, খুব সম্ভব তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি সেটার ভেতর পোরা আছে।

লোকটা পোকায়-খাওয়া হলদেটে দাঁত বার করে বলে 'আমার নাম লাখপতি, দুনিয়ার সবাই বলে লাখুয়া। তোমার নামটা কী?'

লোকটাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায় গরীবের চাইতেও গরীব। তার নাম নাকি লাখপতি! মনে মনে বেশ আমোদই লাগে নাথুনির। পরক্ষণে সে প্রায় রুখে ওঠে, 'আমার নাম দিয়ে কী হবে? মতলব কী তোমার?'

লোকটা অর্থাৎ লাখুয়া থতমত খেয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, 'কোনও মতলব নেই। বাতচিত করতে সুবিধা হয়, তাই জানতে চাইলাম।'

কপাল কুঁচকে ধারালো চোখে লাখুয়ার পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আদ্যোপান্ত দেখে নেয় নাথুনি। তার ত্রস্ত, হতচকিত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না লোকটার মাথায় কোনও রকম দুরভিসন্ধি রয়েছে। তবে জন্মের পর থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছরে দুনিয়ার হালচাল অনেক দেখেছে নাথুনি। জীবনে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সে জানে মুখ দেখে গলে গেলে বহু সময় ঠকতে হয়। বাইরে থেকে কাউকে হয়তো সাধু-মহাত্মা মনে হতে পারে, কিন্তু একটু নাড়াচাড়া দিলেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে মারাত্মক সব ফন্দি।

লাখুয়ার দিকে চোখ রেখে ভেতরে ভেতরে খুব সতর্ক হয়ে থাকে নাথুনি। গলার স্বর সামান্য নরম করে নিজের নামটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বলো, আমার কাছে কী দরকার?'

লাখুয়া বলে, 'নানকিপুরায় যাব।' পেছন দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে দেখাতে বলে যায়, 'উঁহা এক দেহাতের গাঁওবালারা বললে এই মাঠটা পেরুলে

নানকিপুরা টৌন। ঠিক যাচ্ছি তো?'

পলকে নিদারুণ সন্দেহে মনটা ভরে যায় নাথুনির। সে নিজেও নানকিপুরায় যাচ্ছে। লোকটা কি আগাম খবর জোগাড় করে তার পিছু নিয়েছে? পরক্ষণে ভাবে, লাখুয়া হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তার মন্দ উদ্দেশ্য না-ও থাকতে পারে।

নাথুনি বলে, 'গাঁওবালারা ঠিকই বলেছে।' তারপর সামান্য একটু কৌতূহল হয় তার। শুধোয়, 'নানকিপুরায় কোনও কাজে যাচ্ছ?'

লাখুয়া বলে, 'হাঁ। শুনেছি ওখানে বড়ে বড়ে জমিমালিকরা খেতির কাজের জন্যে লোক নেয়। যাচ্ছি, যদি কিছু একটা জুটে যায়। পুরা এক রোজ ভুখা আছি, হাতে একটা পাইসা নেই।'

কী আশ্চর্য, একই কারণে নাথুনি নিজেও নানকিপুরায় চলেছে। ফের মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে তার। কিন্তু লোকটা ভালমানুষের মতো মুখ করে যেভাবে বলেছে তাতে ধন্দ থাকার কথা নয়। নাথুনি বলে, 'আমিও সেখানে যাচ্ছি। ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে যেতে পার। তবে একগো বাত—'

'কী?'

কোমরের গোপন খাঁজ থেকে জং-ধরা আধ হাত চাকুর ফলা ধাঁ করে বার করে আনে নাথুনি। বলে, 'হোঁশিয়ার, বজ্জাতি করলে পেটের ভেতর এটা ঢুকিয়ে দেব। আগেও তিন তিন হারামির পেটে ঢুকিয়েছি।' আসলে ছুরিটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। কাজের খোঁজে উত্তর বিহারের এই অঞ্চলটা তাকে চষে বেড়াতে হয়। মানুষের চেহারা নিয়ে চিতা গিধ আর শিয়ালেরা চারপাশে থিক থিক করছে। কখন অস্ত্রটা কাজে লাগবে কে বলতে পারে।

'হো রামজি—' আঁতকে উঠে তিন পা পিছিয়ে যায় লাখুয়া। নিজের পেটে একটা হাত রেখে আস্তে টোকা দিতে দিতে ভয়ার্ত সুরে বলে, 'এটা ছাড়া দুনিয়ার আর কিচ্ছু আমি বুঝি না, আর কোনও দিকে আমার নজর নেই।'

'সচ?'

'সচ—সচ—সচ। ভয়োয়ান রামজি কসম। বিশ্বাস কর, আমার গলা দিয়ে ঝুটা জবান বেরোয় না।'

'ঠিক হ্যায়।' চাকুর ফলাটা ফের কোমরে শাড়ির নীচে গুঁজে নাথুনি বলে, 'তুমি আমার সাত কদম আগে আগে হাঁটবে। আর পথে একটা কথাও বলবে না।' তার উদ্দেশ্য হল, লাখুয়া সামনে থাকলে তার ওপর নজর রাখা যাবে। কিন্তু পাশাপাশি বা পেছনে থাকলে আচমকা কী করে বসবে, আগে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

'তোমার যেমন মরজি—' বলে সত্যিই গুনে গুনে সাত পা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে লাখুয়া।

এ বার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় নাথুনি। লোকটার যদি বুরা মতলব থেকেও থাকে এবং তার ভালমানুষির খোলসের আড়াল থেকে হুট করে সেটা বেরিয়ে আসে, সহজে কিছু করতে পারবে না। লাখুয়া ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সে প্রস্তুত হয়ে যাবে। লাখুয়ার সঙ্গে হাতিয়ার আছে কিনা জানা নেই। যদি সশস্ত্রও হয়, একটি মাত্র পুরুষের পক্ষে নাথুনিকে কাবু করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

নাথুনি লক্ষ করে, একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না লোকটা। আঠালো কাদায় পা টেনে চলতে চলতে আপন মনেই সে বিড় বিড় করে, 'মিট্টির যা হাল, এভাবে চললে নানকিপুরায় পৌঁছুতে দুফার পার হয়ে যাবে। তখন কি আর কামকাজ পাওয়া যাবে?'

কথাগুলো যত নীচু গলায় বলুক না লাখুয়া—নাথুনি ঠিকই শুনতে পেয়েছে। তারও একই ধরনের দুশ্চিন্তা। নানকিপুরা টাউনে জমি মালিকদের কাছে সে-ও তো চলেছে। তাদের সঙ্গে দেখা না হলে এতটা রাস্তা এত কষ্ট করে ছুটে যাওয়া স্রেফ বরবাদ। আজকের দিনটাও পুরোপুরি উপোস দিতে হবে কিনা কে জানে।

একটা লোক মাত্র সাত কদম আগে আগে হাঁটছে; কাদায় তার পা টানার চবত চবত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকী তার গায়ের ঘামে-ময়লায় মেশানো বোটকা, ভারী গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কাজেই কতক্ষণ আর মুখ বুজে থাকা যায়? রাস্তা তো কম নয়, কথা বলতে বলতে গেলে সময় মোটামুটি কেটে যাবে।

নাথুনি ডাকে, 'এ আদমি—'

সামনের দিকে চোখ রেখে লাখুয়া সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে, এ দিকে থাকো না। ঘর কোথায়?'

'ঘর নেই।'

রীতিমত অবাক হয়ে নাথুনি জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

লাখুয়া পেছন ফিরে তাকায় না। থকথকে মাটিতে পা ডুবিয়ে চলতে চলতে বলে ওঠে, 'এটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কোনটা?'

'তুমি বলেছিলে বাতচিত করা চলবে না। বিলকুল জবান বন্ধ করে হাঁটতে হবে। এখন তুমি আমাকে কথা বলাতে চাইছ। আমার কিন্তু কসুর নেই।'

নাথুনি থতিয়ে যায়। লাখুয়াকে যতটা সাদাসিধে মনে হয়েছিল আসলে দেখা

যাচ্ছে সে ঠিক ততখানি ভালমানুষ নয়। বেশ মিচকে ধরনের, দরকার মতো চোরাগোপ্তা ঘা সে-ও মারতে পারে। নাথুনি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি—'

লাখুয়া এবার বলে, 'যা বলেছি বিলকুল সচ, আমার ঘর নেই।'

'তা হলে থাকো কোথায়?'

'কোই ঠিক নেহি। সারা দিন কামকাজের ধান্দায় ঘুরি। রাতে যেখানে জায়গা পাই—হাটিয়ার চালায়, লোকের বাড়ির চবুতরে কি গাছের তলায়—শুয়ে পড়ি।'

বাড়িঘর নেই, শোয়ার ব্যবস্থা যেখানে সেখানে, এমন উদ্ভট মানুষ নাথুনির চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। লাখুয়া সম্পর্কে তার যেটুকু সংশয়ও বা অবশিষ্ট ছিল, এবার অজান্তেই তা ঘুচে যায়। নিজের ঘর সংসার ছাড়া জগতের কোনও ব্যাপারেই নাথুনির আগ্রহ এতটুকু নেই। কিন্তু অচেনা এই সঙ্গীটির জন্য তার কৌতূহল যেন ক্রমশ অদম্য হয়ে উঠতে থাকে।

সাত কদম পেছনে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে সুখ নেই। তার ওপব লাখুয়া ভুল করেও একবার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে না। সে যা হুকুম দিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলেছে। হঠাৎ নাথুনির অহঙ্কারে কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগে। তার চেহারা যতই জবরদস্ত পুরুষালি ধাঁচের হোক না, তবু সে একটা রক্তমাংসের আওরত। আখাম্বা লোকটা নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে—দুনিয়ার সেরা রাজকুমার? হাত-পা চোখমুখের ছিরি তো ওই। তার এতই দেমাক যে পেছন ফিরে দেখেও না কে তার সঙ্গে চলেছে।

দু'জনে একই তালে মাঝখানের দূরত্বটা বজায় রেখে পা ফেলছিল। হঠাৎ চলার গতিটা বাড়িয়ে লাখুয়ার পাশে চলে আসে নাথুনি। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে লাখুয়া একবার সঙ্গিনীকে লক্ষ করে, তারপর আগের মতোই সামনের দিকে চোখ রেখে কাদায় পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে।

নাথুনি বলে, 'তুমি বললে তোমার ঘর নেই। লেকিন কেউ তো মিট্টি ফোঁড়কে বেরিয়ে আসে না। সবারই মা-বাপ থাকে, ভাই-বহেন থাকে—'

লাখুয়া কাদা ভাঙতে ভাঙতে উদাসীন সুরে বলে, 'তুমি আমার জীওন কহানি জানতে চাইছ?'

'হাঁ। চুপচাপ কতক্ষণ আর হাঁটা যায়! বলো—'

'তোমার ভাল লাগবে না।'

'না লাগুক, আরম্ভ তো করে দাও।'

লাখুয়ার হয়তো বেশি কথা বলতে ভাল লাগছে না। কিন্তু এই নাছোড়বান্দা আওরতটা যেভাবে ধরেছে, এড়ানো খুবই মুশকিল। অগত্যা একটানা, ভোঁতা গলায় সে যা বলে যায় তা এই রকম। উত্তর বিহারের চৌহদ্দি শেষ হয়ে যেখানে নেপালের শুরু, সেইখানে অর্থাৎ দুই দেশের বর্ডারের কাছাকাছি একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতে তার জন্ম। ভাই-বোন নেই, খুব অল্প বয়সে মা-বাপ হারিয়ে বসেছে। যে কয়েক 'ধুর' চাষের জমি তাদের ছিল চাচারা সেটুকু কেড়েকুড়ে নিয়ে তাকে গাঁ-ছাড়া করে দেয়। তারপর থেকেই তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের শুরু। গাঁ থেকে বেরিয়ে লাখুয়া সোজা চলে এসেছিল সাহারসা টাউনে। সেখানে এক কাঠগোলার মালিকের কাছে তিন চার বছর কাজ করেছে। মালিক লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলেই শরাবের বোতল নিয়ে বসত। নেশাটা মাথায় চড়ে বসলে বিলকুল জানোয়ার হয়ে উঠত সে ; হাতের কাছে যা পেত ভেঙে চুরমার করে ফেলত। আর লাখুয়াকে ধরে বেধড়ক পেটাত। মার সইতে না পেরে একদিন সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। তারপর কয়েকটা বছর ছ'সাত জন জমিমালিকের জমিতে লাঙল ঠেলে, কি ধান গেহুঁ কেটে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খরায় জমি চৌচির হয়ে গেলে বা বানে ভাসলে চাষের কাজ পুরোপুরি বন্ধ। চাষ বন্ধ তো লাখুয়ার কামাইও বন্ধ। এভাবে তো বাঁচা যায় না। অগত্যা সে গিয়ে ভিড়েছিল এক নৌটঙ্কির দলে। সেখানে তবলা আর 'ফালুট' (ফ্লুট) বাজানো শিখে বেশ নাম করে ফেলেছিল। কিন্তু তার কপাল, দলটা বেশি দিন টিকল না, উঠে গেল। এ বার সে এক বড় ঠিকাদারের কাছে নৌকরি জুটিয়ে নেয়। এখানে তাকে সড়ক বানানো আর পাথর ভাঙার কাজ করতে হত। এই সব 'গতরচুরণ' কাজে এমন মারাত্মক খাটুনি যে বছর তিনেকের মধ্যে গলা দিয়ে ভলকে ভলকে খুন উঠতে লাগল। হাসপাতালে যেতে ডাক্তারসাব জানিয়ে দিলেন প্রাণে বাঁচতে হলে আপাতত এই মেহনতের কাজ ছাড়তে হবে। ছেড়েও দিল লাখুয়া। তখন থেকে আর নৌকরি বা বাঁধাবাঁধি কাজ নয়, শুরু হল উঞ্ছবৃত্তি। দুনিয়ার তুখড় ভূ-পর্যটকদের মতো সারা উত্তর বিহার ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের কাজ জুটিয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছে সে। এইভাবে জীবনের চল্লিশ বিয়াল্লিশটা বছর কেটে গেছে।

দু'দিন আগে এই বিশাল মাঠের পুব দিকের একটা ছোট টাউনে এসেছিল লাখুয়া। সেখানে কাজটাজ কিছু জোটেনি, তবে লোকজনের কাছে শুনেছে নানকিপুরায় গেলে রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সে বেরিয়ে পড়েছিল।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নাথুনি। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'বহোত কষ্ট করে বেঁচে আছ। তবে আমার হালও তোমার চেয়ে কিছু ভাল নয়।'

লাখুয়া উত্তর দেয় না।

নাথুনি কিন্তু নিজের ঘর-সংসারের কথা সাত কাহন করে না শুনিয়ে ছাড়ে না। তারা থাকে এই মাঠের দক্ষিণ দিকে একটা গাঁয়ে। তার মরদ পুরা তিন সাল বিছানায় নানা রোগে কাবু হয়ে পড়ে আছে। দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের মতো গরীবের চাইতেও গরীব মানুষের টাকাপয়সা, সোনাদানা, জমিজমা কিছুই থাকে না। এ দিকে সব মিলিয়ে চার চারটে পেট। তাই রোজ সকালে কাজের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ে। কিছু কামাই করে আনতে পারলে ভাল, নইলে স্রেফ উপোস।

এমন একটা শোচনীয় জীবন-কাহিনী শোনার পরও এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই লাখুয়ার। তার ভেতর এক ধরনের নিরেট উদাসীনতা রয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার জন্য উদয়াস্ত তাকে এতই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় যে অন্যের দুঃখে বিচলিত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় বা শৌখিনতা তার নেই।

নাথুনি ফের কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভারী জলো বাতাস চিরে চিরে কোত্থেকে যেন একটা গলার স্বর ভেসে আসে। কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছে, কিন্তু তার একটি শব্দও বোঝা যায় না।

নাথুনি আর লাখুয়া থমকে দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। কিন্তু এই বিশাল জনহীন প্রান্তরে একটি মানুষও চোখে পড়ে না। মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে তারা দু'জন ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই।

দুর্বোধ্য সেই কণ্ঠস্বরটি ফের শোনা যায়। একটানা শব্দপুঞ্জের ভেতর থেকে দু-একটি কথা এবার বুঝতে পারে নাথুনিরা। 'এ ভাইয়া—এ বহেনিয়া—আ-আ-আ—' অর্থাৎ কেউ তাদের ডাকাডাকি করছে।

মাঠের চারপাশে তাকাতে তাকাতে এতক্ষণে নাথুনির চোখে পড়ে, ডানদিকে কোনাকুনি, অনেক দূরে মোটরগাড়ির মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক সেটার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে প্রবল বেগে হাত নেড়ে সমানে ডাকছে, 'ইধর—ইধর আও—'

নাথুনি লোকটার দিকে চোখ রেখে লাখুয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হতে পারে বলো তো আদমিটার?'

লাখুয়া বলে, 'কী করে বলব? এই তো পহলে ওকে দেখলাম।'

নাথুনিকে চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'জরুর কোনও মুশকিলে পড়েছে।'

লাখুয়া কিছু বলে না।

দূরের লোকটা এক মুহূর্তের জন্য থামেনি, হাত নেড়ে নেড়ে একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে।

নাথুনি বলে, 'কী করবে?'

লাখুয়া মুখ তুলে দ্রুত আকাশ দেখে নেয়। যে ছন্নছাড়া মেঘগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিল, এখন তারা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সূর্যটা আর দেখা যায় না, মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। দিনের আলোতে যেটুকু জেল্লাও বা ছিল, সেটা যেন ক্রমশ নিভে গিয়ে সমস্ত চরাচরকে ম্লান করে দিচ্ছে।

লাখুয়া বলে, 'আসমানের হাল দেখেছ? বহোত বুরা।'

নাথুনিও আকাশের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ।'

'এখন আদমিটার কাছে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তার ওপর যদি বারিষ নামে, ঝামেলায় পড়ব। ওকে 'না' বলে দিয়ে চল তুরন্ত মাঠ পেরিয়ে যাই।'

'নেহি—'

একটু অবাক হয়ে লাখুয়া জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে চাও?'

নাথুনি জানায়, লোকটা যখন এত কাতরভাবে ডাকাডাকি করছে, নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনও সমস্যায় পড়েছে। ফাঁকা, জনশূন্য প্রান্তরে তাকে একা ফেলে চলে যাওয়া ঠিক নয়।

লাখুয়া আর আপত্তি করে না। বলে, 'ঠিক হ্যায়—'

দু'জনে কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার কাছে চলে আসে। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা তার। থ্যাবড়া নাক, কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, ভাঙাচোরা গাল আর থুতনিতে পাতলা দাড়ি, ঘোলাটে চোখ। খসখসে চামড়ার তলা থেকে হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ভাঙা ভাঙা নখের ভেতর রাজ্যের ময়লা।

লোকটার পরনে দুই বুক-পকেটগুলো খাকি হাফশার্ট আর ঢোলা, বেখাপ্পা ফুলপ্যান্ট যার পায়ের দিক কাদায় পুরোটা মাখামাখি। জামাপ্যান্টের আড়াল থাকলেও বোঝা যায় সে খুবই দুর্বল, বুকের ছাতি বেজায় সরু, অনেকটা পাখির মতো।

লোকটার পেছনে, খানিক দূরে যে মোটরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটার হাল হুবহু তারই মতো। মান্ধাতার বাপের আমলে তৈরি এই ঝরঝরে পুরনো আমলের গাড়িটার সামনের দিকের চেহারা মোটরের মতো কিন্তু পেছনের অংশটা অবিকল যেন বয়েল গাড়ি। কাঠের পাটাতন বানিয়ে সেখানে ওপরে টিনের ছই

বসানো হয়েছে। গরুর বদলে গাড়িটা ইঞ্জিনে টানে, এটুকুই যা তফাত। বয়েল গাড়ি আর মোটর মিলিয়ে এই বিচিত্র ধরনের যান বিহারের এই অঞ্চলে মাল বয়ে বেড়ায়।

দ্রুত একবাব লোকটাকে তার গাড়িসুদ্ধ দেখে নিয়ে নাথুনি বলে, 'অমন শিয়ারের (শিয়াল) মতো চিল্লাচ্ছিলে কেন? কা হুয়া তুমনিকো?'

একটানা, না থেমে লোকটা বলে, 'বহেনিয়া, আমি বিলকুল ফেঁসে গেছি। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী করব, কী না করব, ভেবে ভেবে যখন দিমাগ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন ভাগোয়ান রামজির কিরপায় তোমাদের দেখতে পেলাম। তোমরা আমাকে বাঁচাও—'

লোকটার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে নাথুনি আর লাখুয়া হকচকিয়ে যায়। নাথুনি জিজ্ঞেস করে, 'কীসে ফাঁসলে তুমি, সব খুলে বলো।'

লোকটা হড়বড়িয়ে এবার যা বলে তা এইরকম। তার নাম চৌপটলাল। নানকিপুরা টৌনের সবচেয়ে বড় মোটর মেরামতি কারখানা আর গ্যারেজের মালিক বিন্ধ্যাচলি সিং রাজপুতের কাছে থাকে। গাড়ি সারাই ছাড়াও বিন্ধ্যাচলির ট্রান্সপোর্টের বিরাট কারবার। অনেকগুলো লরি, মাটাডোর রয়েছে তার। আর আছে মোটরের সঙ্গে বয়েল গাড়ির ভেজাল দেওয়া গণ্ডাতিনেক অদ্ভুত চেহারার যান। বিন্ধ্যাচলি এই সব লরি টরি মাল বওয়ার জন্য ভাড়া খাটায়। যে সমস্ত দুর্গম জায়গায় ভারী লরি ঢুকতে পারে না সেখানে বয়েল গাড়ি-মার্কা মোটর পাঠাতে হয়। এই ধরনের একটা গাড়ি অর্থাৎ এই মুহূর্তে ওধারে যেটা পড়ে আছে, পাঁচ সাত সাল ধরে সেটা চালিয়ে আসছে চৌপটলাল।

পরশু সকালে, ঘ্যানঘেনে বারিষ সবে শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই সে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল ভোগবানিতে। এই মাঠটা দক্ষিণ দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরও মাইল আষ্টেক গেলে বরখা নদীর পাড়ে ভোগবানি-হল মস্ত জমজমাট এক গঞ্জ। সেখানে গিয়ে মাল খালাস করার পর ধুম জ্বরে পড়ে যায় চৌপটলাল। দেড় দিন ওখানে কাটিয়ে আজ ভোরে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভোগবানি পেছনে ফেলে এই মাঠ পর্যন্ত পৌঁছুবার আগে একটা গাঁয়ের কাছে আসতেই গাঁওবালারা তার গাড়ি রুখে জবরদস্তি দুটো লোককে গাড়িতে তুলে দেয়। এদের একজন পুরুষ, অন্যটি মেয়েমানুষ। দু'জনেরই অনেক বয়স, এবং তারা মারাত্মক রোগে ভুগছে। গাঁওবালারা বলেছিল, ওদের নানকিপুরার বড় হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। প্রথমটা রাজী হয়নি চৌপটলাল কিন্তু বুড়ো মানুষ দুটোর হাল দেখে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করেনি। কিন্তু মাঠে এসে খানিক

দুর এগুতেই সব গোলমাল হয়ে গেছে ; ইঞ্জিন আচমকা বানচাল হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ধৈর্য ধরে সমস্ত শোনার পর নাথুনি বলে, 'বুঝলাম। আমাদের কাছে কী চাও তুমি?'

প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে আচমকা নাথুনি আর লাখুয়া দু'জনের দুটো হাত ধরে চৌপটলাল বলে, 'এসো আমার সঙ্গে—'

'কঁহা?'

'এসোই না—'

একরকম টানতে টানতেই নাথুনিদের গাড়ির পেছন দিকটায় নিয়ে আসে চৌপটলাল। তার হাত ছেড়ে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওই যে দেখো—'

টিনের ছইয়ের তলায় কাঠের পাটাতনের ওপর দুটো মানুষ পাশাপাশি পড়ে আছে। পুরুষটির সারা গায়ে শাঁস বলতে কিছু নেই। হাড়ের ওপর জেলজেলে, কোঁচকানো চামড়া জড়ানো, গলাটা সরু লিকলিকে। তার ওপর ছোবড়া-ছাড়ানো শুকনো নারকেলের মতো মাথা। একটু আধটু যে চুল রয়েছে তা যেন পাটের ফেঁসো। পরনে ময়লা, চিটচিটে, ঠেটি কাপড় আর অজস্র ফুটোওলা ফতুয়া। মেয়েমানুষটার হালও তারই মতো। রুগ্ন, পাকিয়ে-যাওয়া চেহারা। একটা ছেঁড়া টেনা দিয়ে গা কোনওরকমে ঢাকা।

দু'জনেই বেহুঁশ হয়ে আছে। মেয়েমানুষটির চোখদুটি বোজা, কিন্তু মুখটা খোলা। মাঝে মাঝে তার গলা থেকে খুব ক্ষীণ, কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর বুড়ো লোকটার সারা গা চেচকের (বসন্ত) গুটিতে বোঝাই, একটা ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই। মনে হয় তার প্রচণ্ড জ্বর, মুখটা একেবারে টসটস করছে। চোখ অবশ্য মেয়েমানুষটার মতো বন্ধ নয়, পুরোপুরি খোলা, ছানি-পড়া তারা দুটো একেবারে স্থির। কোনওরকম সাড়াশব্দ করছে না সে।

দু'জনকে দেখতে দেখতে আঁতকে ওঠে নাথুনি। বলে, 'হো ভাগোয়ান, এ তুমি কাদের নিয়ে এসেছ! এখনও জিন্দা আছে কী করে?' একটু থেমে বলে, 'বুড়হাটার তো চেচক। বুড়হির কী হয়েছে?'

চৌপটলাল জানায়, গাঁওবালাদের কাছে সে শুনেছে, বুড়ির ক'দিন ধরে সমানে ভেদবমি চলছে।

নাথুনি বলে, 'এমন বিমার আদমিদের আনতে গেলে কেন? ওদের ছেলেমেয়ে, রিস্তেদার কেউ নেই?'

'নেহি।'

'বুড়হি কি বুড়হার ঘরবালি?'

'নেহি, দোনোকা কোঈ রিস্তা নেহি।'

চৌপটলাল এই দুটি মানুষ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানিয়ে দেয়। এদের জামিজমা, ঘরবাড়ি কিছুই নেই। গাঁওবালাদের করুণার ওপর নির্ভর করে তারা এতকাল বেঁচে আছে। যার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতে, কেউ ফেরায় না। একরকম ভিখমাঙোয়াই বলা যায়।

নাথুনি এবার শুধোয়, 'তা গাঁওবালারাই তো ওদের নানকিপুরার অসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল কেন?'

চৌপটলাল বলে, 'যা বারিষ, এর ভেতর এতটা রাস্তা বয়ে আনে কী করে? ওদের তো আর মোটর-উটর নেই। আমার গাড়িটা ফাঁকা ছিল বলেই না তুলে দিয়েছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর চৌপটলাল ফের বলে, 'এখন তোমরা দুই বুড়হা বুড়হির ওপর থোড়েসে কিরপা কর।'

নাথুনি জিজ্ঞেস করে, 'ক্যায়সে?'

হাতজোড় করে চৌপটলাল বলে, 'এখনই ওদের নানকিপুরার অসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই বানচাল গাড়ি আমি একা টেনে নিয়ে যেতে পারব না। তোমরা যদি হাত না লাগাও—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

নাথুনি একেবারে আঁতকে ওঠে। সে যা জবাব দেয় তা এইরকম। এক হাঁটু থকথকে কাদার ভেতর দিয়ে কমসে কম তিন মাইল গাড়ি ঠেলে নানকিপুরায় যেতে জান বেরিয়ে যাবে। কখন পৌঁছুতে পারবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই; হয়তো বিকেল হয়ে যাবে। অথচ জরুরী কাজে তাকে এবং লাখুয়াকে দুপুরের আগে ওই টাউনটায় না গেলেই নয়।

নাথুনি বলে, 'মাফ কর। আমরা চললাম—' লাখুয়াকে বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? তুরন্ত পা চালিয়ে দাও—'

লাখুয়া তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, 'হাঁ, হাঁ—জরুর।'

ওরা যখন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, নাথুনির একটা হাত ধরে কাতর মুখে চৌপটলাল বলতে থাকে, 'মাত যাও বহেন। আমরা থাকতে দুটো মানুষ মরে যাবে? যদি ওদের বাঁচাতে পারি, থোড়েসে কোসিস করে দেখব না?'

চৌপটলালের বলার ভঙ্গিতে এমন এক তীব্র ব্যাকুলতা ছিল যে নাথুনি আর লাখুয়া থমকে যায়। এতক্ষণ নিজেদের চিন্তাতেই তারা ডুবে ছিল। কখন

নানকিপুরায় পৌঁছুবে, কখন জমি-মালিকদের কাছে কাজ জুটিয়ে কিছু কামাই করবে, এ ছাড়. আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের মনে হয়, শুধু পেটের দানা জোটানো ছাড়াও দুনিয়ায় আরও কিছু করণীয় আছে। দুটো মানুষ জনশূন্য বিশাল মাঠের মাঝখানে বেঘোরে মারা যাবে, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

নাথুনি আর লাখুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাবটা যেন বুঝতে পারে চৌপটলাল। নাথুনির হাতটা ধরাই ছিল, আস্তে টান দিয়ে বলে, 'আও—'

নাথুনি লাখুয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী আর করবে। দেখি, মানুষ দুটোকে যদি বাঁচানো যায়—'

লাখুয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

এবার তিন জনে মিলে গাড়িটা ঠেলতে শুরু করে। সামনের দিকে এক হাতে স্টিয়ারিং, আরেক হাতে জানালা চেপে ধরে ঠেলছে চৌপটলাল। পেছনে রয়েছে নাথুনি আর লাখুয়া। কিন্তু কাদায় গাড়ির চাকা এমন জাম হয়ে আটকে গেছে যে প্রথম দিকে এতটুকু নড়ানো গেল না।

লাখুয়া বলে, 'হাতের জোরে হবে না, কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা মারতে থাকো। তাতে যদি কাজ হয়—'

নাথুনি বলে, 'হাঁ।'

দু'জনে শরীরের সবটুকু শক্তি কাঁধে জড়ো করে, গাড়ির দু'ধারে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে। চৌপটলাল অবশ্য আগের মতোই স্টিয়ারিং আর জানালা ধরে ঠেলে চলেছে। কিন্তু তার গায়ে আর কতটুকু জোর! তবু যেটুকু পারছে, করছে। গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তার গলার শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে উঠেছে। চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর গাড়ি নড়ে ওঠে; ধীরে ধীরে কাদাব ঘন স্তর কেটে কেটে এগিয়ে যায়।

এধারে জমাট-বাঁধা মেঘপুঞ্জ তার কাজ শুরু করে দেয়। গোড়ার দিকে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর প্রবল তোড়ে বৃষ্টি নেমে আসে। মনে হয়, মাথার ওপর থেকে গোটা আকাশ গলে গলে ঝরে পড়ছে। সেই সঙ্গে উলটোপালটা বাতাস মাঠের ওপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে যেন। আর আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ চমকে যায়। কড় কড় আওয়াজে কাছে, দূরে বাজ পড়তে থাকে। সমস্ত চরাচর যেন পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে যাচ্ছে।

চারিদিকের সব আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ির ছাউনির তলা থেকে

বুড়ো লোকটার গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তার।

হঠাৎ নাথুনির খেয়াল হয়, গাড়ির পেছন দিকের খোলা জায়গাটা দিয়ে তোড়ে বৃষ্টির জল ঢুকে বুড়ো আর বুড়িকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। একে বুড়োর গা-ভর্তি চেচকের গুটি, তার ওপর রয়েছে জ্বরের তাড়স। এত ভিজলে আর হাসপাতালে পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না; তার আগে মৌত অবধারিত।

নাথুনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চৌপটলালকে ডাকে, 'এ গাড়িবালা—'

প্রথমটা শুনতে পায়নি চৌপটলাল। বারকয়েক ডাকাডাকির পর তার সাড়া পাওয়া যায়, 'কী বলছ বহেন?'

'একবার এদিকে এসো।'

'কায়?'

'এসোই না—

গাড়ি ঠেলা স্থগিত রেখে নাথুনিদের কাছে চলে আসে চৌপটলাল।

নাথুনি বুড়োবুড়িকে দেখিয়ে বলে, 'বারিষ ঠেকাতে না পারলে ওরা মরে যাবে। তোমার গাড়িতে বোরা উরা (বস্তা) কি চট আছে?'

'কেন?'

'পেছন দিকটা ঢেকে দিতে হবে।'

বস্তা বা চট টট কিছু ছিল না, তবে সামনের দিকে সিটের তলায় বড় এক টুকরো তেরপল রয়েছে। দ্রুত সেটা এনে তিনজনে ছাউনির পেছন দিকের খোলা অংশটা এমনভাবে ঢেকে দেয় যাতে ভেতরে আর জল ঢুকতে না পারে।

ফের গাড়ি ঠেলতে শুরু করে তারা। জামাকাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। পাঁচ হাত দূরেও এখন নজর চলে না। ডাইনে বাঁয়ে সামনে, যেদিকে তাকানো যাক সব ঝাপসা। পৃথিবীতে তারা তিনজন, একটা বানচাল গাড়ি এবং দুটো মরণোন্মুখ বুড়োবুড়ি ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

বৃষ্টির কামাই নেই। যেন আবহমান কাল ধরে ঝরেই চলেছে। ভিজে ভিজে হাত-পা সিটিয়ে গিয়েছিল নাথুনিদের. গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে মনে হচ্ছিল, হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছে। শরীরের হাড়-মাংস যেন ছিঁড়ে পড়বে।

•   •

হাইওয়ের কাছে নাথুনিরা যখন এল, বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে মলিন একটু আভা দেখা দিয়েছে। বোঝা যায়, দিনটা ফুরিয়ে আসছে। খানিক পরেই সন্ধে নেমে যাবে।

এখান থেকে নানকিপুরার হাসপাতাল বেশি দূরে নয়। যে জীবনীশক্তিটুকু

নাথুনিদের মধ্যে তখনও অবশিষ্ট ছিল তার জোরে শেষ পর্যন্ত চৌপটলালের গাড়ি সেখানে পৌঁছে যায়।

দুই বুড়োবুড়িকে তখনই হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়। ডাক্তারসাবরা জানান—চেচক, জ্বর, ভেদবমি, বৃষ্টিতে ভেজা এবং গাড়ির হটরানির পরও ওরা বেঁচে আছে।

দুটো 'বিমার' বেহুঁশ মানুষকে যে জীবন্ত অবস্থায় হাসপাতালে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছে, এতেই যাবতীয় উদ্বেগ কেটে যায় নাথুনিদের। মাঠের মাঝখানে বুড়োবুড়িকে ফেলে এলে নির্ঘাত তারা মাবা পড়ত। সেটা ভীষণ আক্ষেপের ব্যাপার।

চৌপটলাল বলে, 'তোমাদের জন্যে মানুষদুটো বেঁচে যাবে, মনে হচ্ছে। ভগোয়ান তোমাদের ভালাই করবে।'

নাথুনিরা একটু হাসে। তারপর বিদায় নিয়ে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় চলে আসে।

লাখুয়া শুধোয়, 'এবার কী করবে?'

নাথুনি বলে, 'কী আর, ঘরে ফিরে যাব।'

'একবার জমি-মালিকদের খোঁজ করবে নাকি?'

'কোই ফায়দা নেহি।'

'তবু চলো না, যদি দু-একজন থেকে যায়। ছোটামোটা একটা কাম যদি মেলে—'

আগ্রহশূন্যের মতো নাথুনি বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

নানকিপুরা টাউনের একধারে অনেকগুলো বিরাট বিরাট ঝাঁকড়া-মাথা কড়াইয়া গাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ সকালে চারিদিকের ভাড়াটে খেতমজুরেরা এসে সেগুলোর তলায় জড়ো হয়। জমি-মালিকের লোকেরা এখান থেকে দরকারমতো মজুর বেছে নিয়ে যায়।

কড়াইয়া গাছের নীচে এসে দেখা গেল সব সুনসান। কেউ কোথাও নেই। অর্থাৎ আজকের মতো মজুর বাছাবাছির কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

নাথুনি বলে, 'কী বলেছিলাম? নিজের চোখে দেখলে তো।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে লাখুয়া।

নাথুনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'অন্ধেরা হয়ে আসছে। তুমি কি নানকিপুরায় থেকে যাবে?'

'হাঁ।'

'চলি। কাল আবার কামকাজের খোঁজে আসব। তখন যদি থাকো, দেখা হবে।'

'হাঁ। লেকিন—'

'কা?'

'তখন বলেছিলে, আটা ছাতু কিছু না নিয়ে গেলে বালবাচ্চা নিয়ে উপোস দিতে হবে।'

'উপোস দেওয়াটা আমাদের আদত (অভ্যাস) হয়ে গেছে। না হয় আরেকটা দিন ভুখা থাকব। তবু তো দুটো বুড়হা বুড়হিকে বাঁচিযে নিয়ে আসতে পেবেছি, কী বলো?'

'হাঁ।'

একটু হাসে নাথুনি, তাবপব ঝাপসা হয়ে আসা, ম্লান আকাশের তলা দিয়ে দূরে, হাইওয়ের ওধারে ধু ধু প্রান্তরের দিকে চলে যায়।

———